হেমেন্দ্রকুমারের

কিশোর সঞ্চয়ন

হেমেন্দ্রকুমারের

কিশোর সঞ্চয়ন

অভ্যুদয় প্রকাশ-মন্দির
৬, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলকাতা-১২

উপন্যাস

প্রদীপ ও অন্ধকার	১

গল্প

বাড়ি, বুড়ো, বুট	৫৫
হাবুবাবুর কীর্তি-কাহিনী	৬২
একরত্তি মাটি	৬৬
যে ছুরি কথা কয়	৭৭
বনবাসী অভিশাপ	৮৫

নাটক

অলৌকিক	৯৮

কবিতা

যখন আমি ছোট্ট ছিলাম	১২৯
বেড়াল-দাদুবুড়োর চিঠি	১৩০
শান্ত ছেলে	১৩২
দুপুরে	১৩৩
সব মানুষের মনে মনে	১৩৫
কবি নজরুল ইসলাম	১৩[illegible]
পরমান্ন	১৩৮

প্রবন্ধ

শিবদাস ভাদুড়ী	১৪০
মরণ-বিজয়ীর দল	১৪৬

প্রথম প্রকাশ : আষাঢ় ১৩৭০, জুন ১৯৬৩। দ্বিতীয় সংস্করণ : আষাঢ় ১৩৭৬, জুন ১৯৬৯। প্রকাশ করেছেন : অমিয়কুমার চক্রবর্তী, ৬, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলকাতা-১২। প্রচ্ছদ এঁকেছেন : চারু খান। ছেপেছেন : সরোজকুমার চক্রবর্তী, শ্রীবিষ্ণু প্রেস, ২৩এ, ওয়ার্ড ইন্‌স্টিটিউশন স্ট্রীট, কলকাতা-৬।

৪.০০

শ্রদ্ধাঞ্জলি

প্রতিভা মানুষের জন্মগত সম্পদ। শুধু-মাত্র প্রচেষ্টার দ্বারা ও জিনিস আয়ত্ত করা সম্ভব নয়। কিন্তু পৃথিবীতে বিভিন্ন যুগে কয়েকজন মানুষ জন্মগ্রহণ করেছিলেন—যাঁদের প্রতিভা একটি বিশেষ দিকে সার্থকতার স্বর্ণতোরণ নির্মাণ করেই ক্ষান্ত থাকেনি—জীবনের বিভিন্ন দিকে বিস্তৃত হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে ইতালির লিওনার্দো দা ভিঞ্চি, জার্মানির গেটে ও আমাদের রবীন্দ্রনাথের নাম সহজেই মনে পড়ে। এঁরা প্রত্যেকেই ক্ষণজন্মা রূপে প্রসিদ্ধ।

হেমেন্দ্রকুমার রায়ও (১৮৮৮-১৯৬৩) ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। যদিও তাঁর প্রতিভার দান সজল বাংলা দেশের বাইরে ছড়িয়ে পড়ে নি, কিন্তু সমসাময়িক মানদণ্ডে বিচার করলে তাঁর কীর্তিস্তম্ভকে অভ্রংলিহ বলে মনে হয় এবং বর্তমান স্টাণ্টধর্মী রিক্ত সাহিত্যের মরুর প্রতি দৃষ্টিপাত করলে তাঁর বিয়োগ-ব্যথা নিঃসন্দেহে তীব্রতর হয়ে ওঠে।

হেমেন্দ্রকুমারের জীবনধারা তাঁর রচনার মতই বহুমুখী। তাঁর পিতৃদত্ত নাম প্রসাদ রায় এবং এই নামে তিনি 'ভারতী' ও 'মৌচাক' প্রভৃতি পত্রিকায় অনেক লিখেছেন। বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলিত সরস্বতী তাঁর মনে শ্রদ্ধা জাগাতে পারে নি, সেজন্যেই তিনি বিশ্বভাণ্ডারের দিকে অত সহজে এগিয়ে যেতে পেরেছিলেন। তিনি কিছুদিন কেরানির জীবনও বরণ করে নিয়েছিলেন, কিন্তু সেই বেড়াজালও অবিলম্বে ছিন্ন করে সাহিত্য সাধনাকেই জীবনের অবলম্বন করে তুললেন। তাঁর আদর্শকে তিনি পেশার রূপ দিলেন স্বচ্ছন্দেই; কিন্তু মনে রাখতে হবে যে তখনকার দিনে বাণীর উপাসকরা সহজে লক্ষ্মীদেবীর প্রসাদ লাভ করতে পারতেন না।

হেমেন্দ্রকুমার কৈশোরে চিত্রশিল্পী ছিলেন। তাঁর গৃহে স্বহস্ত-অঙ্কিত চিত্রগুলির নিদর্শন আজও বর্তমান আছে। তিনি এককালে কণ্ঠ-সঙ্গীতের সাধনা করতেন, তাঁর নিজস্ব গানের রেকর্ডও নাকি বার হয়েছিল। তিনি মোহনবাগান ক্লাবের খেলা দেখতে ভালোবাসতেন এবং যৌবনে সেকালের বিখ্যাত ক্লাব হেয়ার স্পোর্টিং-এ কিছুকাল খেলেওছিলেন। তাঁর লিখিত

অনেকগুলি গান রেকর্ড হয়েছে—'মন-কুসুমের রঙ-ভরা', 'অন্ধকারের অন্তরেতে অশ্রুবাদল ঝরে' ও 'শেফালি তোমার আঁচলখানি' প্রভৃতি সঙ্গীতের কথা আজও কেউ ভুলে যায় নি।

হেমেন্দ্রকুমার তাঁর স্মরণীয় অবদান রেখে গিয়েছেন নাট্য ও স্টেজ-বিষয়ক রচনাবলীতে। তিনি ব্যক্তিগত জীবনে শিশির ভাদুড়ী, নির্মলেন্দু লাহিড়ী, ক্ষীরোদপ্রসাদ ও যোগেশ চৌধুরী প্রভৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বে আবদ্ধ ছিলেন। এ সম্পর্কে তাঁর বহু উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ আছে। তিনি একজন নৃত্যশিক্ষক ছিলেন। কিছুকাল অধুনালুপ্ত 'নাচঘর' পত্রিকার সম্পাদনাও করেছেন।

সাহিত্য-অঙ্গনে হেমেন্দ্রকুমারের আবির্ভাব বড়দের লেখক রূপে। তিনি অসংখ্য উপন্যাস ও গল্পের বই লিখেছেন। তাঁর রচিত 'পায়ের ধুলো', 'কালবৈশাখী', 'আলেয়া' প্রভৃতি উপন্যাস সেকালে সমাদৃত হয়েছিল। শোনা যায় 'প্রবাসী'-সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্রের রচনার পরিবর্তে তাঁর উপন্যাস 'বেনো জল' প্রকাশ করেন। বিখ্যাত জার্মান সাহিত্যানুরাগী ডক্টর ডাগ্‌নের তাঁর দুটি ছোট গল্পের বই জার্মান ভাষায় অনুবাদ করে বিশ্বের সাহিত্য-দরবারে স্থান পাবার যোগ্য এই অভিমত প্রকাশ করেন।

কিন্তু এসব হল হেমেন্দ্রকুমারের জীবনের নিতান্ত গৌণ ব্যাপার। তাঁর সাহিত্য-প্রয়াস তথা বৃহত্তর জীবনের সার্থকতা কোথায়, তা স্পষ্ট প্রমাণ হল যখন তিনি 'মৌচাকে'র মাধ্যমে ছোটদের জন্যে লেখায় হাত দিলেন। সে এক যুগান্তকারী পরিবর্তনের ইতিহাস। রূপকথা ও হাস্যরসের অরুণ লগ্ন এক নিমেষে অন্তর্হিত হল। নব যুগ-সূর্যের মশাল হাতে হেমেন্দ্রকুমার অগ্রসর হলেন—সেই আলোয় দেখা গেল, শিশুসাহিত্যের রাজ্যের সীমানা কত বড়। তার মধ্যে গোপন আছে কত অজানা রহস্যের ভাণ্ডার, কত স্বপ্নের মণিমহল!

ছোটদের জন্যে হেমেন্দ্রকুমার কী করেন নি? ওদের দেশে যখন 'ট্রেজার আইল্যাণ্ড' ও 'রবিনসন ক্রুসো'র যুগ চলেছে, তখন 'উকুনে বুড়ির রূপকথা' শুনে আমাদের ক্ষান্ত থাকতে হত। হেমেন্দ্রকুমার 'যকের ধন' লিখে সেই অভাব পূর্ণ করলেন। এর পরে তিনি লিখে গেলেন আরও অসংখ্য বই—যা শিশুমনে জাগিয়ে গেল সুদূরের দোলা। প্রকৃত শিক্ষামূলক গোয়েন্দা-কাহিনীর আমদানি করলেন 'জয়ন্তের কীর্তি' লিখে। অনুবাদের মাধ্যমে 'ড্র্যাকুলা', 'ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন', 'ডক্টর জেকিল অ্যাণ্ড মিঃ হাইড' ও আরো নানা কাহিনীর

রস পরিবেশন করে গেলেন। 'আজব দেশে অমলা'র মত আশ্চর্য সুন্দর অনুবাদ ছোটদের জন্যে করতে গেলে যে কী পরিমাণ প্রতিভা ও লিপি-চাতুর্যের প্রয়োজন, তা পড়লে বুঝতে বিলম্ব হয় না। ছোটদের জন্যে তিনি প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখলেন 'পঞ্চনদের তীরে'। এছাড়া হাসির গল্প, বৈজ্ঞানিক গল্প, প্রবন্ধ, সংবাদ-সমীক্ষা, নাটক, কবিতা—কোন কিছুই তিনি লিখতে বাকি রাখেন নি।

ছোটদের সাহিত্যের সমৃদ্ধির জন্যে যাঁর একক দান সবচেয়ে বেশি, সেই হেমেন্দ্রকুমার আজ আর নেই। কিন্তু আমাদের মনের মহলে তিনি একটি কল্পনার মায়াপুরী সৃষ্টি করে গিয়েছেন, সেখানে প্রতিনিয়ত চলেছে বিপদ ও দুঃসাহসের দ্বন্দ্ব—যার চেয়ে উপভোগ্য বাল্যে ও কৈশোরে আর কিছুই নেই। সেই দেশের এক মন্দিরে চিরদিন স্মৃতির প্রদীপ জ্বালিয়ে আরতি ঘটবে—এর ক্ষয় নেই, সমাপ্তি নেই।

বিমলকুমার চট্টোপাধ্যায়
রিজেণ্ট পার্ক
জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭০

উপন্যাস

প্রদীপ ও অন্ধকার

১

অথ পঞ্চম-বাহিনী-সন্দেশ

নর-নারায়ণের নাম শুনেছেন? পৌরাণিক নর-নারায়ণ নয়, বিংশ শতাব্দীর অতি-আধুনিক নর-নারায়ণ।

নরেন্দ্র মজুমদার ও নারায়ণ চৌধুরী, দুই বন্ধুর নাম। তাদের মতন একজোড়া বন্ধু সচরাচর দেখা যায় না। দুটিতে যেন মানিক-জোড়! যেখানে তাদের একজনকে দেখা যাবে না, সেখানে দেখা যাবে না তাদের আর একজনকেও। যেন যাঁহা বাহান্নো তাঁহা তিপ্পানো থাকবেই। যেখানে যেখানে নরেন্দ্র আছে, ধরে নিতে হবে সেখানে আছে নারায়ণও। তাই লোকে তাদের নাম দিয়েছে নর-নারায়ণ।

নর-নারায়ণের নাম এমন সুপরিচিত হয়েছে কেন জানেন? অপরাধ-তত্ত্বে তাদের মতন বিশেষজ্ঞ বাংলা দেশে খুবই কম আছে। লোকে তাদের ডিটেকটিভ বলেই মনে করে। আমরাও তাদের ডিটেকটিভ বলেই মনে করতে পারি, কিন্তু আসলে তারা সাধারণ ডিটেকটিভ নয়। তারা পুলিশ-বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত নয়, তারা কাজ করে স্বাধীনভাবেই। এ-শ্রেণীর গোয়েন্দাদের সাধারণ পুলিশ কোনদিনই সুনজরে দেখে না, এ-কথা সকলেই জানে। কিন্তু নর-নারায়ণের—বিশেষ করে নরেন্দ্রের কথা স্বতন্ত্র। কারণ, কোন মামলা নিয়ে জড়িয়ে পড়লে পুলিশের বড় বড় কর্তারাও নরেন্দ্রের কাছে এসে পরামর্শ করতে লজ্জিত হন না। যে-কোন কঠিন সূত্রের অতি জটিল জট খুলতে নরেন্দ্রের মতন ওস্তাদ আর নেই। যেখানে কারুর মাথা খেলে না, সেখানেও পঙ্গু নয় নরেন্দ্রের মাথা। তার মূল্যবান সাহায্য লাভ করে পুলিশ অনেক বড়-বড় মামলার কিনারা

করে যথেষ্ট সুনাম কিনেছে, অথচ নরেন্দ্র জনসাধারণের কাছে কোন-দিনই নিজের নামকে বিজ্ঞাপিত করতে রাজি হয়নি। জনসাধারণ তাকে চেনে না বললেই চলে। তার বাহাদুরি জানে কেবল পুলিশ এবং অপরাধীরাই।

কিন্তু যে ব্যক্তি এমন অসাধারণ বাহাদুর, তাকে চোখে দেখলে আপনারা দস্তুরমত অবাক হয়ে যাবেন। ভগবান তার দেহখানিকে গড়েছেন প্রায় বামন করেই। লম্বায় সে চার ফুট আড়াই ইঞ্চির চেয়ে বেশি হবে না, আর চওড়ায় তাকে দেখতে প্রবাদ-প্রসিদ্ধ তাল-পাতার সেপাইয়ের মতন। কিন্তু দেহের হ্রস্বতা ও কৃশতার জন্যে তার যা-কিছু ক্ষতি হয়েছে, সেটা পূরণ করে নিয়েছে তার অদ্ভুত মাথাটা। কারণ, দেহের তুলনায় তার মাথাটি অসম্ভব রকম প্রকাণ্ড। দেখলে ভয় হয় যে, তার অত বড় মাথাটার ভার ঐটুকু পলকা দেহ বেশিদিন বোধহয় সহ্য করতে পারবে না। দূর থেকে তাকে দেখায় যেন একটা হেঁড়ে-মাথা রোগা-লিকলিকে ছোট্ট ছেলের মতন। বাস্তবিক, চেহারার দিক দিয়ে সকলকেই সে রীতিমত হতাশ করে দেয়।

কিন্তু নরেন্দ্রের প্রাণের বন্ধু নারায়ণের চেহারা হচ্ছে একেবারে অন্য রকম। তাকে দানব বললেও অত্যুক্তি হবে না। তার মতন সুদীর্ঘ দেহ কলকাতায় আর কারুর আছে বলে মনে হয় না। তার উচ্চতা হচ্ছে সাড়ে সাত ফুট। চওড়াতেও তার দেহ জাগায় মনের ভিতরে বিপুল বিস্ময়। তার বুকের ছাতির বেড় সহজ অবস্থায় আটচল্লিশ ইঞ্চি এবং স্ফীত হলে সেই আশ্চর্য ছাতির বেড় দাঁড়ায় গিয়ে পঞ্চান্ন কি ছাপ্পান্ন ইঞ্চিতে। বড় বড় পালোয়ান গুণ্ডাও বিরুদ্ধে দাঁড়াতে গেলে ভয়ে কুঁচকে পড়ে। শিশুরা তাকে দেখলে ককিয়ে ওঠে। সে এমন আশ্চর্য শক্তির অধিকারী যে, দুই-তিনজন আরোহীর সঙ্গে একখানা বড় মোটরগাড়িও দুই হাতে টেনে শূন্যে তুলতে পারে।

গায়ের রঙে এবং প্রকৃতিতেও নরেন্দ্রের সঙ্গে নারায়ণের আকাশ

পাতাল তফাত। নরেন্দ্রের গায়ের রং ধবধবে সাদা। আর নারায়ণ হচ্ছে একেবারে আবলুস কাঠের মতন কালো, এমন অসাধারণ কালো রংও বাঙালিদের মধ্যে চোখে পড়ে না।

কিন্তু নরেন্দ্রের প্রকৃতি হচ্ছে ধীর, স্থির, শান্ত। সে কথা কয় ওজন করে, আর যে-কোন কথা বলবার আগে ভেবে-চিন্তে তবে উচ্চারণ করে। আর নারায়ণ? তার হো-হো হাসির ধাক্কায় ল্যাজ খসে পড়বার ভয়ে ঘরের মধ্যে ঢোকে না টিকটিকিরাও। সে মহা চঞ্চল; এক জায়গায় পাঁচ মিনিট স্থির হয়ে বসে থাকতে পারে না। কথা কইতে কইতে সর্বদাই সে বসছে, উঠে দাঁড়াচ্ছে এবং মেঝে-কাঁপানো পদযুগলকে চালনা করে ঘুরে আসছে এদিকে ওদিকে—যেন মানুষ-চর্কি। আর তার মুখের কথা? তার মুখ যেন কথার তুবড়ি! এবং তার মুখের কথার ভিতরে শিশুত্বও বড় কম থাকে না।

বিচিত্র এ মানুষদুটি—কেউ কারুর মতন নয়, অথচ দুজনেই দুজনার মনের মতন।

লোকে বিস্ময় প্রকাশ করে বলে, তেলে আর জলে এমন মিল হল কেমন করে?

নারায়ণ হেসে বলে, "আমরা কেউ তেলও নই আর জলও নই। ভগবান আমাদের একসঙ্গে গড়েছেন পরস্পরের অভাব পূরণ করবার জন্যে। নরেনের দেহ নেই বটে, কিন্তু মস্তিষ্কের দিক দিয়ে হচ্ছে মস্ত। আমার মস্তিষ্কের বালাই নেই, কিন্তু আমার দেহখানা নয়ন ভরে দর্শন করছ তো? ব্যাপার কী জানো ভায়া? নরেন আমার হয়ে ভাবে, আর আমি নরেনের হয়ে হাতে-নাতে কাজ করি।"

লোকে বলে, "তাহলে তুমি নিজেকে যন্ত্র বলে মনে কর নাকি?"

নারায়ণ বলে, "ঠিক তাই। আমি হচ্ছি যন্ত্র, আর নরেন হচ্ছে যন্ত্রচালক।"

এই হল নর-নারায়ণের পরিচয়। এইবারে দেখা যাক তারা এখন কি করছে।

বর্ষাকালের একটি ভিজে প্রভাত। ঘোর মেঘাচ্ছন্ন আকাশ ঢালছে হুড়-হুড় করে জলের ধারা। রাজপথ হয়েছে যেন একটি নদীর মত। সকালবেলাতেও রাস্তায় মানুষের সাড়া এত কম যে, মনে হয় শহরের ঘুম যেন এখনো ভাঙেনি। ঘরে ঘরে কেরানিরা প্রায় রাত্রির মতন কালো আকাশ এবং জলতরঙ্গময় রাজপথের দিকে তাকিয়ে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে ভাবছে, আজ চাকরির মানরক্ষা করা যায় কেমন করে!

খাবার টেবিলের দুইধারে সামনাসামনি বসে নরেন এবং নারায়ণ। নরেনের সুমুখে টেবিলের উপরে রয়েছে একখানি খবরের কাগজ, দুইখানি পাতলা টোস্ট ও এক পেয়ালা চা।

আর নারায়ণের সম্মুখে রয়েছে দস্তুরমত সমারোহের ব্যাপার। খুব বড় একটি চায়ের পেয়ালা, মস্ত একটা চায়ের কেটলি, থাকে-থাকে সাজানো অনেকগুলো টোস্ট, গোটা-ছয়েক এগ-পোচ, গোটা-ছয়েক সিদ্ধ ডিম আর আস্ত একখানা প্লাম্-পুডিং। সে একবার খাবারের থালার দিকে হাত বাড়াচ্ছে, তারপর এক চুমুকে সব চা নিঃশেষ করে ঘন-ঘন কেটলি তুলে নিয়ে শূন্য পেয়ালায় ঢালছে চায়ের ধারা।

নরেনের একটিমাত্র পেয়ালার আধখানাও যখন খালি হয়নি, নারায়ণের এক কেটলি চা এবং সমস্ত খাবার হল তার মুখের ভিতরে অদৃশ্য।

নারায়ণ চিৎকার করে উঠল, "বেয়ারা! বেয়ারা!"

নরেন ভ্রূ কুঞ্চিত করে মৃদু স্বরে বললে, "আবার বেয়ারাকে কেন?"

—"পেট ভরল না, আরো খাবারের দরকার।"

—"নারায়ণ, তোমার এই বাড়াবাড়িটা আমি পছন্দ করি না। সকালবেলাতেই উঠে তুমি যা গলাধঃকরণ করলে, তাই খেয়ে আমার কেটে যেতে পারে পুরো দুটো দিন।"

নিজের প্রকাণ্ড কালো মুখে ধবধবে দাঁতের বিদ্যুৎ খেলিয়ে কড়িকাঠ-ফাটানো কণ্ঠে নারায়ণ বললে, "বন্ধু, তুমি আর আমি? হাতি আর পিঁপড়ে? তোমার পনেরো দিনের খোরাকেও আমার দেহের একদিনের বেশি চলবে না যে!"

নরেন বললে, "কেবল দেহের খোরাক জুগিয়ে জুগিয়ে দিনে দিনে তুমি তোমার মস্তিষ্ককে আরো কহিল করে ফেলছ। হাতি খুব প্রকাণ্ড জীব বটে, কিন্তু তাকে দাসত্ব করতে হয় ক্ষুদ্র মানুষেরই।"

নারায়ণ বললে, "কিন্তু ভায়া, আমার মস্তিষ্কের ভার তো আমি তোমাকেই অর্পণ করেছি। এজন্যে আমাকে খোঁটা দিয়ে তোমার কোনই লাভ হবে না। আমার মস্তিষ্ক তুমিই, আর তোমার দেহ হচ্ছি আমি। কেমন, আমাদের মধ্যে এই বন্দোবস্তই পাকা হয়ে আছে কি না? অতএব আমাকে দেহরক্ষা করবার অবসর দাও। বেয়ারা, বেয়ারা! আরো খানছয়েক টোস্ট, আর আধ-ডজন এগপোচ!"

নরেন আর কিছু বলবার চেষ্টা না করে চায়ের পেয়ালায় ছোট একটি চুমুক দিয়ে খবরের কাগজের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করলে। আবার এল এগপোচ, টোস্ট আর এক কেটলি চা। নারায়ণ আবার নতুন খাবারগুলোকে আক্রমণ করলে বিপুল বিক্রমে।

ঠিক এই সময়ে সদর দরজায় একখানা গাড়ি থামার শব্দ হল। নরেন কাগজ থেকে মুখ তুলে বললে, "এই বাদলে বাড়ির দরজায় আবার কার গাড়ি এসে থামল!"

নারায়ণ একটা বিরক্তিপূর্ণ মুখভঙ্গী করে বললে, "হয়ত কোন মক্কেল! ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, আজ যেন কেউ আমাদের বাইরে বেরুবার অনুরোধ না করে! আমার এতখানি ডাগর দেহ একবার ভিজে গেলে শুকোতে লাগবে গোটা একটা দিন।"

ঘরের ভিতরে যে হোমরা-চোমরা লোকটি এসে ঢুকলেন, তিনি হচ্ছেন পুলিশের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী। তাঁর নাম শচীন্দ্রনাথ দত্ত।

নরেন বিস্মিতভাবে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "এ কী অপ্রত্যাশিত ব্যাপার। এমন দুর্যোগে আপনি।"

শচীনবাবু বললেন, "এক সমস্যায় ঠেকে গিয়েছি মশায়! তাই ঠকবার আগেই আপনার সঙ্গে পরামর্শ করতে ছুটে এসেছি।"

নরেন বললে, "ঠকবার ভয় আছে নাকি?"

—"আছে বৈকি! হয়ত এর মধ্যে বেশ খানিকটা ঠকেও গিয়েছি।"

নরেন বললে, "পুলিশ যেখানে নিজের অক্ষমতা স্বীকার করে, ব্যাপারটা সেখানে মারাত্মক বলেই সন্দেহ হয়।"

—"হ্যাঁ মশাই, মারাত্মক বিভ্রাটের মধ্যেই প'ড়ে আছি।"

—"ভালো, বসতে আজ্ঞা হোক। চা-টা কিছু ইচ্ছা করেন?"

—"কিছু না, কিছু না! ও সব ঝঞ্ঝাট চুকিয়ে এসেছি।" বলতে বলতে শচীনবাবু একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়লেন।

নরেন একখানা সোফার উপরে গিয়ে হেলান দিয়ে বসল, তার ছোট দেহখানি সোফার ভিতরে প্রায় অদৃশ্য হয়ে গেল।

শচীনবাবু বললেন, "ব্যাপারটা অত্যন্ত গুরুতর আর গোপনীয়। গোড়াতেই আপনাকে এই কথাটা বলে রাখতে চাই।"

নরেন কোন জবাব দিলে না, শচীনবাবুর দিকে তাকিয়ে রইল জিজ্ঞাসু চোখে।

শচীনবাবু বললেন, "খবরের কাগজে পঞ্চম-বাহিনীর কথা আপনি নিশ্চয়ই দেখেছেন। আমাদের সন্দেহ হচ্ছে, এদেশের কোন কোন গুপ্তচর আমাদের প্রধান শত্রু জাপানকে গোপনে সাহায্য করছে।"

—"আপনার এমন সন্দেহের কারণ?"

—"আমরা প্রমাণ পেয়েছি, কোন-কোন সরকারি গুপ্তকথা বাইরে ব্যক্ত হবার আগেই একেবারে শত্রুপক্ষের কানে গিয়ে উঠছে। এমনকি, এখানে কোন বড় জাহাজ বন্দরে এসে পৌঁছবার তিন চারদিন পরেই সেই খবর সরাসরি গিয়ে হাজির হচ্ছে জাপানিদের কাছে।"

—"কেমন করে জানলেন ?"

—"শত্রুশিবিরে আমাদেরও গুপ্তচরের অভাব নেই তো ! আমরা খবর পাচ্ছি তাদের কাছ থেকেই।"

—"গুরুতর কথা বটে। কারুকে সন্দেহ করতে পেরেছেন ?"

শচীনবাবু দুঃখিতভাবে মাথা নেড়ে বললেন, "না। আমরা একেবারে অন্ধকারে পড়ে আছি।"

—"আপনি আমাদের কী করতে বলেন ?"

—"আমার বক্তব্য এখনো শেষ হয়নি। ইতিমধ্যেই আমরা অপরাধীদের আবিষ্কার করবার কিছু কিছু চেষ্টা করেছি। প্রথমে আমরা যে গোয়েন্দাকে নিযুক্ত করি, মামলার ভার পাবার কয়েকদিন পরেই তার মৃত্যু হয়। তারপর নিযুক্ত করি আর-একজন গোয়েন্দাকে। আশ্চর্যের বিষয়, কয়েকদিন পরেই তাকেও ইহলোক ত্যাগ করতে হয়। তারপর নিযুক্ত করি তৃতীয় ব্যক্তিকে, কিন্তু সেও আজ বেঁচে নেই। বুঝতেই পারছেন, ঘটনাগুলো কেবল রহস্যময়ই নয়, রীতিমত সন্দেহজনক।"

সোফার উপরে সোজা হয়ে উঠে বসে নরেন ধীরে ধীরে বললে, "তিন-তিনজন লোক একই মামলার ভার নিয়ে পরে পরে মারা পড়েছে ? কথাটা শুনতে কেমন অদ্ভুত লাগে। কেমন করে তারা মারা পড়ল ? কেউ তাদের খুন করেছে ?"

—"খুনোখুনি বা মারামারির কোন প্রমাণই পাওয়া যায়নি।"

—"তবু তারা মারা পড়ল কেন ?"

—"স্বাভাবিকভাবেই বিছানায় শুয়ে।"

—"মানে ?"

—"তারা প্রত্যেকেই মারা পড়েছে একই রোগে !"

—"রোগটা কি ?"

—"নিউমোনিয়া।"

নরেন আবার সোফার উপরে এলিয়ে পড়ে, দুই চক্ষু মুদে স্তব্ধ

হয়ে রইল। নারায়ণ হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে ঘরের চারিদিকে একটা চক্র দিয়ে আবার শচীনবাবুর সামনে এসে বসে পড়ল। তার মুখে ফুটে উঠেছে একটা হতভম্ব ভাব।

নরেন আবার চক্ষু মেলে মৃদুকণ্ঠে বললে, "স্বাভাবিক মৃত্যুর ভিতরেও যে এমন অস্বাভাবিক যোগাযোগ থাকতে পারে, এ-কথা সহজে বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না। একই মামলার ভার নিয়ে তিনজনে মারা পড়ল একই নিউমোনিয়া রোগে?"

নারায়ণ বললে, "বাবা! আমার মাথা তো গুলিয়ে গেছেই, পেটের পিলেও বিলক্ষণ চমকে গিয়েছে! আজকাল নিউমোনিয়া ব্যাধিও শত্রুপক্ষে যোগদান করেছে নাকি?"

শচীনবাবু বললেন, "এখন বলুন দেখি নরেনবাবু, এ-রহস্যের তল কোথায়? এগুলো যদি হত্যাকাণ্ড না হয়, তাহলে এগুলো কী? এই কথা জানবার জন্যেই আমি এসেছি আপনার কাছে।"

নরেন তেমনি মৃদুস্বরেই বললে, "এত তাড়াতাড়ি জোর করে আমি কোনই মত প্রকাশ করতে রাজি নই। পঞ্চম-বাহিনীর নাম আমরা প্রথম শুনেছি এই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হবার পর থেকেই। প্রথম-প্রথম পঞ্চম-বাহিনীর অর্থ বুঝতেও কষ্ট হত, এখন খবরের কাগজে তার উদাহরণ পেয়ে বুদ্ধি কতকটা খুলেছে। কিন্তু গত মহাযুদ্ধেও তথাকথিত পঞ্চম-বাহিনীভুক্ত একজাতীয় জীবের অভাব ছিল না। তাদের অধিকাংশ ইতিহাসই প্রকাশিত হয়েছে, আর আমিও তা পড়ে দেখবার সুযোগ পেয়েছি। আমার স্মরণ হচ্ছে, সেই সময়ে এই ধরনেরই কোন-কোন ঘটনা ঘটেছিল।"

শচীনবাবু সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলেন, "ঘটনাগুলো কি-রকম?"

—"আপাতত তা শুনে কাজ নেই। কারণ, গোড়া থেকেই কোন সিদ্ধান্তে উপস্থিত হলে আমরা অনায়াসেই বিপথে গিয়ে উপস্থিত হতে পারি। এখন আপনার কী কর্তব্য জানেন?"

—"বলুন।"

—"আপনি আজই প্রচার করে দিন যে, এই মামলার সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ করেছি আমি।"

—"তাতে আপনার কিছু সুবিধে হবে ?"

—"যথেষ্ট। আমি দেখতে চাই, আমার সন্দেহ সত্য কি না। অর্থাৎ এই তিনটে মৃত্যুর মধ্যে কোন গুরুতর অপরাধের নিদর্শন আছে কি না। আমি অপরাধীদের দৃষ্টি আমার দিকে আকৃষ্ট করতে চাই। আজ আর কোন কথা নয়, আমাকে এখন কিছু ভাববার সময় দিন।" নরেন আবার তার দুই চক্ষু মুদে ফেলে ঠিক যেন ঘুমিয়ে পড়ল।

শচীনবাবুর হয়ত আরও কিছু জিজ্ঞাস্য ছিল। কিন্তু তিনি নরেনের স্বভাব জানতেন। তিনি বুঝলেন, আপাতত সে কিছুতেই ভঙ্গ করবে না তার মৌন ব্রত। অতএব আর দ্বিরুক্তি না করে সেদিনের মতন বিদায় গ্রহণ করলেন।

২
পকেটমারের কীর্তি

শচীনবাবু ঘরের ভিতর থেকে যেই অদৃশ্য হলেন, নরেন অমনি আবার চক্ষু মেলে বললে, "নারায়ণ, অবিলম্বে গাত্রোত্থান কর।"

নারায়ণ তখনি উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "তারপর ?"

—"তারপর সোজা রাস্তায় গিয়ে হাজির হও।"

—"আমি প্রস্তুত। কিন্তু কারণ ?"

—"কারণ, জানলার ভিতর দিয়ে আমি বার বার লক্ষ্য করেছি, রাস্তার ওধারের ফুটপাতের উপরে অত্যন্ত উদাসীনভাবে এক ভদ্রলোক মূর্তির মত চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল। ওর ঐ উদাসীনতা সন্দেহজনক, কারণ শচীনবাবুর গাড়ি চলে যাওয়ার পরেই ও-লোকটিরও পদযুগল

রীতিমত সচল হয়ে উঠল। এখন আমি আর তাকে দেখতে পাচ্ছি না। তুমি তার পিছনে পিছনে ধাবমান হতে পারবে ?"

—"অনায়াসে। কিন্তু তাকে চিনব কেমন করে ?"

—"সে ও-ফুটপাত ধরে এইমাত্র উত্তর দিকে গিয়েছে। তার পায়ের দিকটা আমি দেখতে পাইনি, কিন্তু তার গায়ে আছে একটি নীল রঙের পাঞ্জাবি, চোখে আছে চশমা, ঠোঁটে আছে গোঁফের রেখা, মাথায় আছে গান্ধি-টুপি আর হাতে আছে মোটা মালাক্কা বেত। মাথায় সে মাঝারি আর তার গায়ের রং তোমার চেয়ে ফর্সা হলেও রীতিমত কালো। যাও।"

নারায়ণ দ্রুতপদে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

নরেন হঠাৎ গলা চড়িয়ে বললে, "নারায়ণ, আর একটা দরকারি কথা শুনে যাও।"

দরজার ওপাশ থেকে নিজের মস্ত মুখখানা বাড়িয়ে নারায়ণ বললে, "কী হুকুম হুজুর ?"

—"লোকটা এখনো আমাদের উপরে হয়ত কোন সন্দেহ করতে পারেনি। খুব সম্ভব তুমি ওর আড্ডার সন্ধান পাবে। যদি পাও, ওর আড্ডার উপরে পাহারা রাখবার ব্যবস্থা করে এস।"

—"আচ্ছা" বলে নারায়ণের মুখ আবার আড়ালে চলে গেল।

নরেন নিজের মনেই ভাবতে লাগল, কিছুকাল আগেও এ-দেশি অপরাধীদের সঙ্গে বিলাতি অপরাধীদের তফাত ছিল যথেষ্ট। কিন্তু আজকাল এ-দেশেও মাঝে-মাঝে এমন অপরাধের দৃষ্টান্ত দেখা যায়, যার আদর্শ আছে সাত সাগরের ওপারে। জানি না, আজ যে মামলাটার ভার গ্রহণ করলুম, সেটাও ঐ জাতীয় কি না।

* * * *

ঘণ্টা-তিন পরে নারায়ণ আবার ফিরে এল।

নরেন তখন বসে বসে খান-কয়েক বই নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল। মুখ তুলে বললে, "কী খবর নারায়ণ ?"

—"খবর ভাল। আমি একেবারে লোকটার ডেরা পর্যন্ত না দেখে ছাড়িনি। লোকটা থাকে রজনী বোস স্ট্রীটের একখানা প্রকাণ্ড ব্যারাক-বাড়িতে ঘর ভাড়া নিয়ে। সে বাড়িতে নানা জাতের লোকের বাস, তাদের অনেকেই কেউ কারুর সঙ্গে পরিচিত নয়। সেখানে হিন্দুও আছে, মুসলমানও আছে, বাংলার নানা জেলার লোকও আছে, আবার পশ্চিমের নানাদেশী মানুষেরও নমুনা আছে। এমন কি দু-ঘর মাদ্রাজিরও খোঁজ পেয়েছি।"

—"সেখানে কোন পাহারার ব্যবস্থা করে এসেছ?"

—"করেছি বৈকি! বাড়ির সামনে বিজয়কে দাঁড় করিয়ে রেখে এসেছি।"

—"কোন্ বিজয়? চোর বিজয়, না পকেটমার বিজয়?"

—"পকেটমার।"

—"বেশ করেছ। ছোকরা যেমন চালাক, তেমনি চটপটে।"

এইখানে একটুখানি ব্যাখ্যার দরকার। আপন-আপন চেহারার বিচিত্র বিশেষত্বের জন্যে নরেন্দ্র ও নারায়ণ বৃহৎ জনতার ভিতরে থেকেও সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করত। কোনরকম ছদ্মবেশই নরেনের বালকের মতন দেহের ক্ষুদ্রতা এবং নারায়ণের দানবের মতন দেহের বিপুলতা ঢেকে রাখতে পারত না। গোয়েন্দাগিরির পক্ষে এটা ছিল অত্যন্ত অসুবিধাকর।

এই অসুবিধা দূর করবার জন্যে তারা একটি উপায় অবলম্বন করেছিল। তারা মাহিনা দিয়ে পুষেছিল এমন কয়েকটি জীবকে, আগে যাদের পেশা ছিল রাহাজানি, গুণ্ডামি, চুরি ও পকেট-কাটা প্রভৃতি।

এ-শ্রেণীর লোক পুলিশে চাকরি না নিলেও গোয়েন্দাগিরির বহু বিশেষত্বের সঙ্গে সুপরিচিত থাকে। সর্বদা পুলিশের ও জনসাধারণের গতিবিধির উপরে নজর রাখতে রাখতে তাদেরও দৃষ্টি হয়ে ওঠে অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। এবং প্রকাশ্যে থেকেও কী কৌশলে আত্মগোপন করতে হয়, তারা ভাল করেই জানে সে গুপ্তকথা।

এরা নর-নারায়ণকে দেখত প্রভুর মত। তাদের সংসর্গে এসে তারা পুরোদস্তুর সাধু না হলেও অসৎ পথের দিকে সহজে পা বাড়াতে চাইত না। অন্তত তাদের পক্ষ থেকে এইটুকু বলা যেতে পারে, নরেন ও নারায়ণকে তারা কোনদিন ঠকাবার চেষ্টা করেনি, বরং প্রাণপণে আদেশ অনুযায়ী কাজ করে নিমকের মর্যাদা রক্ষা করবার চেষ্টা করে এসেছে। এ-শ্রেণীর লোকের চরিত্র ছিল নরেনের নখদর্পণে। তাদের বশ করবার কৌশল সে জানত।

সেইদিনই সন্ধ্যার সময় পকেটমার বিজয় নরেনের সামনে এসে সেলাম ঠুকে দাঁড়াল।

নরেন বিরক্তভাবে বললে, "বিজয়, তুমি পাহারা ছেড়ে এখানে কেন?"

বিজয় তুই হাত জোড় করে বললে, "হুজুর, আপনাকে একটা কথা বলবার জন্যে সেখানে নসিরামকে পাহারায় রেখে আমি ছুটতে ছুটতে আসছি।"

—"কী কথা?"

—"গোড়া থেকেই বলি, শুনুন হুজুর। সেই ব্যারাক-বাড়িখানার সামনে আমার এক আলাপী লোকের একখানা পানের দোকান ছিল। সারাদিন আমি সেইখানেই বসে ছিলুম। যে লোকটার উপরে আমাকে নজর রাখতে বলা হয়েছে, বিকেলবেলায় দেখি সে হঠাৎ বাড়ি থেকে বেরিয়েই হন-হন করে একদিকে এগিয়ে চলল। আমিও পোষা কুত্তার মতন লোকটার পিছু নিলুম। শ্যামবাজারের মোড়ে এসে তার সঙ্গে আমিও একখানা বাসে উঠে বসলুম। রাসবিহারী এভিনিউয়ের মোড়ের কাছে লোকটা বাস থেকে নেমে পড়ল। তারপর টালিগঞ্জের দিকে হেঁটে খানিকটা গিয়ে একখানা বড় বাড়ির ভিতরে ঢুকে গেল, আমি চুপ করে রাস্তার উপরেই দাঁড়িয়ে রইলুম। আন্দাজ আধ ঘণ্টা পরে বাড়ির বাইরে এসে সে আবার উঠল ধর্মতলার এক ট্রামে। আমিও উঠলুম। ট্রামে এত ভিড় যে আমাদের

দু-জনেরই বসবার জায়গা হল না। তার গায়ে গা মিশিয়েই আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে হল। তারপর হুজুর—"

—"বল, থামলে কেন? তারপর?"

মাটির দিকে মুখ নামিয়ে বিজয় বাধো-বাধো গলায় লজ্জিতভাবে বললে, "তারপর হুজুর, কেন জানি না, আমি আর লোভ সামলাতে পারলুম না।"

নরেন একটুখানি হেসে বললে, "বুঝেছি। তুমি লোকটার পকেট মেরে দিয়েছ?"

অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বিজয় বললে, "কী আর বলব হুজুর, হাতদুটো কেমন যেন নিসপিস করে উঠল! পোড়া মনকেও কত যে বোঝাই, মন তবু বশ মানতে চায় না। তাই—"

নরেন বাধা দিয়ে অধীর স্বরে বললে, "অত আর ওজর দেখাবার দরকার নেই, আসল কথা বল!"

বিজয় কাঁচুমাচু মুখে বললে, "তার পকেট থেকে পেয়েছি একটা মনিব্যাগ, একখানা চিঠি, আর ওষুধ-ভরা ছোট্ট একটা কাঁচের নলচে। আমার মনে হল এগুলো হুজুরের কাজে লাগতে পারে। তাই আমি ছুটে এসেছি।"

নারায়ণ বিজয়ের পিঠের উপরে এক থাবড়া বসিয়ে দিয়ে চিৎকার করে বলে উঠল, "ভ্যালা মোর বাপ্‌রে, জীতা রহো!"

নরেন গম্ভীরভাবে বললে, "আচ্ছা, চিঠিখানা আর ওষুধের নলচেটা আমার হাতে দাও। মনিব্যাগটা তুমি রাখতে পার। আর তোমাকে দরকার নেই।"

বিজয় একটা সেলাম ঠুকে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে সরে পড়ল।

ছোট্ট একটি কার্ডবোর্ডের বাক্সের ভিতরে পুরু তুলো জড়িয়ে একটি কাঁচের চুঙি সযত্নে রাখা হয়েছে। চুঙিটির দু-মুখই বন্ধ, ডাক্তাররা ইনজেকশন দেবার সময় এইরকম ওষুধ-ভরা কাঁচের চুঙি ব্যবহার করেন।

নরেন সেটিকে আলোর দিকে ধরে অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে পরীক্ষা করলে। তারপর নিজের মনেই বললে, "চুঙির ভিতরে এই জলীয় পদার্থটা যে কি, আপাতত তা বোঝা যাচ্ছে না। দেখছি বৈজ্ঞানিক উপায়ে পরীক্ষা করা দরকার।"

চুঙিটিকে আবার যথাস্থানে রক্ষা করে নরেন চিঠি-ভরা খোলা খামখানা টেবিলের উপর থেকে তুলে নিলে। তারপর খামখানা উল্টেপাল্টে ভাল করে দেখে বললে, "দেখ নারায়ণ, খামের উপরে ডাকঘরের ছাপ নেই। পত্রলেখক বোধহয় ডাকঘরকে বিশ্বাস করে না, চিঠি বিলি করেছে অন্য কোন লোকের হাত দিয়ে। খামের এককোণে খালি একটি নাম লেখা রয়েছে—'নৃপেশ'। আচ্ছা, এইবার চিঠিখানা বার করে পড়ে দেখা যাক।"

চিঠিখানা এই :

"নৃপেশ,

শচীন দত্তের গতিবিধির উপরে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখবে। সন্ধান নেবে, সে আর কোন নতুন গোয়েন্দা নিযুক্ত করেছে কি না। যদি কোন নতুন খোঁজ-খবর পাও, তাহলে তখনি আমাদের তিন নম্বর বাড়িতে চলে আসবে। আমি দিন-তিনেকের জন্যে ঐ বাড়িতে থাকব। তারপর আমাকে পাবে হপ্তাখানেকের জন্যে আমাদের চার নম্বর বাড়িতে।

ছোটবাবু।"

নরেন বললে, "চিঠির উপরে তারিখ লেখা রয়েছে তেসরা। আজ হচ্ছে পাঁচ তারিখ। তাহলে পত্রলেখক আজই তিন নম্বরের বাসা ত্যাগ করবে। ধরে নেওয়া যাক, বিজয় আজ টালিগঞ্জের যে বাড়ি পর্যন্ত গিয়েছিল সেইখানাকেই তিন নম্বরের বাড়ি বলা হয়েছে। তাহলে এর পরেও আছে চার নম্বরের বাড়ি, যার ঠিকানা আমরা জানি না।"

নারায়ণ বললে, "যদিও তুমি আমার মস্তিষ্কের অস্তিত্ব স্বীকার

কর না, তবু আমার মনে হচ্ছে, এই চিঠিখানার ভেতরে আছে যেন কোন ষড়যন্ত্রের গন্ধ।”

নরেন বললে, “তোমার মস্তিষ্ক না থাকুক, ঘ্রাণশক্তি যে আছে, এ-কথা আমি কোন দিনই অস্বীকার করি না। হ্যাঁ, এই পত্রে ষড়যন্ত্রের আভাস পাওয়া যাচ্ছে বৈকি। এই ছোটবাবু নামক মহাত্মাটি যে কে, তা আমি জানি না। কিন্তু এটুকু বেশ বুঝতে পারছি, এই লোকটি আমাদের শচীনবাবুর পিছনে নিযুক্ত করেছে গুপ্তচর। কোন একটি মামলার জন্যে শচীনবাবু আর কোন নতুন গোয়েন্দা নিযুক্ত করেন কি না, এটা জানবার জন্যে তার যথেষ্ট আগ্রহ। মামলাটা কোন্ জাতীয় সেটা তুমি কিছু আন্দাজ করতে পারছ কি?”

নারায়ণ মাথা নেড়ে বললে, “আন্দাজি ঢিল ছোঁড়ার অভ্যাস যে আমার নেই, তুমি এ কথা জানই তো নরেন!”

নরেন বললে, “কিন্তু আমার সে অভ্যাস আছে। এই কথাগুলো লক্ষ্য কর—‘আর কোন নতুন গোয়েন্দা’। এথেকে কি এই বুঝায় না যে, এটা হচ্ছে এমন কোন মামলা যার জন্যে শচীনবাবু আগে এক বা একাধিক গোয়েন্দা লাগিয়েছিলেন, পরে আবার নতুন গোয়েন্দা নিযুক্ত করতে পারেন? কিন্তু সেই বিশেষ মামলাটি কী? শচীনবাবুর নিজের মুখেই আমরা শুনেছি, পঞ্চম-বাহিনীর অপরাধীদের আবিষ্কার করবার জন্যে পুলিশ থেকে পরে-পরে তিনজন গোয়েন্দাকে কাজে লাগানো হয়েছিল, আর তিনজনই একে-একে মারা পড়েছে। হ্যাঁ নারায়ণ, এ সেই পঞ্চম-বাহিনীর মামলা না হয়ে যায় না।”

নারায়ণ অবাক হয়ে ভাবতে লাগল।

নরেন বললে, “ব্যাপারটা গোড়া থেকে আরো ভাল করে বোঝবার চেষ্টা করা যাক। পুনরুক্তি আমি ভালোবাসি না, কিন্তু তোমার মাথার ভিতরে জটিল কিছু ঢোকাতে গেলে পুনরুক্তি ছাড়া উপায় নেই। শোনো:

‘পুলিশ টের পেয়েছে, য়ুরোপের মতন এদেশেও পঞ্চম-বাহিনীর

আবির্ভাব হয়েছে। তারা এখানকার সামরিক গুপ্তকথা সংগ্রহ করে শত্রুপক্ষের কাছে পাঠিয়ে দেয়। কী উপায়ে তারা সংবাদ সংগ্রহ করে, আর কী উপায়েই বা তা যথাস্থানে প্রেরণ করে, আমরা এখনো সে-সব জানতে পারিনি। আর সত্য-সত্যিই এখানে পঞ্চম-বাহিনীর অস্তিত্ব আছে কি না, তাও জোর করে মানা যায় না। আমাদের কাজ করতে হবে কেবল পুলিশের সন্দেহের উপরেই নির্ভর করে। শেষ পর্যন্ত গিয়ে হয়ত দেখব, আমরা ছুটে মরেছি কোন মরীচিকার পিছনে পিছনে।

"কিন্তু আপাতত দেখা যাচ্ছে, পুলিশ হাওয়ার উপরে কোন মামলা খাড়া করেনি, পুলিশের সন্দেহের মূলে বস্তু আছে। পুলিশ দেখেছে, এখানকার সামরিক তথ্য বাইরে প্রকাশ পাবার আগেই জাপানিদের কাছে গিয়ে হাজির হচ্ছে। এই আশ্চর্য রহস্যের তল খোঁজবার জন্যে পুলিশ একজন গোয়েন্দা নিযুক্ত করলে। হঠাৎ সে নিউমোনিয়া রোগে মারা পড়ল। অবশ্য এজন্যে বিস্মিত হবার দরকার নেই, কারণ নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে মারা পড়া খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার।

"তারপর নিযুক্ত হল দ্বিতীয় গোয়েন্দা, আর সেও মারা পড়ল ঐ নিউমোনিয়া রোগেই। পুলিশ কিঞ্চিৎ চমকিত হল বটে, কিন্তু তখনো ভাবলে, এ হচ্ছে দৈবের খেলা। তারপর তৃতীয় গোয়েন্দার প্রবেশ এবং ঐ একই রোগে আক্রান্ত হয়ে সেও করলে ইহলোক থেকে প্রস্থান। পুলিশ এবার দস্তুরমত ভীত হয়ে উঠেছে, কারণ এ-রকম অসম্ভব দৈব বিড়ম্বনা কল্পনাও করা যায় না। পুলিশ তাই তাড়াতাড়ি আমাদের কাছে এসেছে সাহায্য প্রার্থনা করবার জন্যে। এই মামলায় নতুন গোয়েন্দা নিযুক্ত হলেই সে নিউমোনিয়া রোগে মারা পড়ে কেন? ভিন্ন-ভিন্ন রোগে তারা মারা পড়লে হয়ত পুলিশ এতটা সজাগ হয়ে উঠত না—যদিও একই মামলায় নিযুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই উপর-উপরি তিন-তিন গোয়েন্দার মারা পড়াটাও হচ্ছে যথেষ্ট সন্দেহজনক।

"বুঝে দেখ নারায়ণ, এইবারে এই মামলায় নিযুক্ত হয়েই আমরা দৈবক্রমে একখানা অদ্ভুত পত্র হস্তগত করেছি। পত্রলেখক তার এক চরের উপরে আদেশ দিয়েছে, পুলিশ কোন নতুন গোয়েন্দা নিযুক্ত করে কি না সে যেন সেই সন্ধান নেয়। এখন তোমার কী মনে হয়? অন্ধকারের ভিতরে একটু আলোর আভাস দেখতে পাচ্ছ কি?"

টেবিলের উপরে সশব্দে মুষ্টি প্রহার করে নারায়ণ বলে উঠল, "ঠিক! ঠিক! এইবারে আমারও চোখ ফুটল!"

নরেন ঘাড় নাড়তে নাড়তে বললে, "শেষ পর্যন্ত তোমার চোখ ফুটেছে দেখে পরম আশ্বস্ত হলুম। হ্যাঁ। শচীনবাবু আবার একজন নতুন গোয়েন্দার সাহায্য নিয়েছেন—আর সে হচ্ছি আমি। তারপরে ভাববার কথা হচ্ছে, রাস্তা থেকে আজই একটি উদাসীন ভদ্রলোক দেখে গিয়েছে আমার সঙ্গে শচীনবাবুর মিলন। তাই সে রিপোর্ট দাখিল করবার জন্যে টালিগঞ্জের পত্রলেখকের সেই তিন নম্বরের বাড়িতে গিয়ে হাজির হয়েছিল। সেখানে কি পরামর্শ হয়েছে, আমরা তা জানি না। তবে এইটুকু অনুমান করতে পারি, রিপোর্ট পেয়ে ছোটবাবু নিশ্চয়ই খুব চনমনে হয়ে উঠবেন। অতএব আমাদের যে-কোন ঘটনার জন্যে প্রস্তুত হয়ে থাকতে হবে।"

বিপুল উৎসাহে একটি লম্ফত্যাগ করে সোফার ওপাশ থেকে এপাশে এসে পড়ে নারায়ণ বলে উঠল, "ফুলচন্দন পড়ুক তোমার মুখে! হ্যাঁ বন্ধু, আমি চাই ঘটনা, ঘটনা—ঘটনার ঘোরঘটা! মুহূর্তে মুহূর্তে নতুন নতুন বিপদ আর বিস্ময় আর উত্তেজনা! আমার এ দেহ হচ্ছে দস্তুরমত পুরুষের দেহ, সোফার নরম কুশনে হেলান দিয়ে বসে থাকবার জন্যে ভগবান এ দেহ নির্মাণ করেন নি।"

নরেন কিছুমাত্র উৎসাহের লক্ষণ না দেখিয়ে বললে, "এখন আমার মনে প্রশ্ন জাগছে, এই ছোটবাবুটির নাম আর পরিচয় কী? দলের মধ্যে সে কোন্ স্থান দখল করে বসে আছে? সে-ই কি দলপতি, না ছোটবাবুর উপরেও মেজবাবু আর বড়বাবু আছেন? এই

দলটি চালনা করছে কোন্ মস্তিষ্ক? যদি তারা পঞ্চম-বাহিনীর লোকই হয়, তাহলে কোন্ উপায়ে শত্রুদের সঙ্গে খবর আদান-প্রদান করছে? প্রশ্ন হচ্ছে অনেকগুলি, তাড়াতাড়ি সব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে বলে মনে করি না।"

নারায়ণ বললে, "কোন ভাবনা নেই। ইচ্ছা করলে আমরা আজই সব প্রশ্নের উত্তর আদায় করতে পারি।"

—"কেমন করে?"

—"চল আজই সেই ব্যারাক থেকে নৃপেশকে ক্যাঁক্ করে ধরে আনি।"

—"তারপর?"

—"তারপর আর কি, নৃপেশ যদি সহজে বশ না মানে, আমার দু-চারটে কিল আর চড় খেলেই মনের কথা উগরে দেবার পথ পাবে না। এক-একটি কিলে তার এক-একখানা হাড় আমি গুঁড়ো করে দেব।"

নরেন মৃদু হেসে বললে, "তোমাকে কেবল হাতির মতন দেখতে নয়, তুমি হচ্ছ হস্তিমূর্খ। নৃপেশ যদি পাকা অপরাধী হয়, তাহলে তুমি কিল মেরে তার মুখ ভেঙে দিলেও সে পেটের কথা বাইরে প্রকাশ করবে না। আর নৃপেশকে আমরা ধরে আনবই বা কোন্ আইনের জোরে? তাকে আইনের ফাঁদে ফেলা যায়, তার এমন কোন অপরাধের কথা এখনো আমরা আবিষ্কার করতে পারিনি। বরং আইনত অপরাধ করেছি আমরাই, কারণ তার পিছনে পকেটমার লেলিয়ে দিয়ে আমরা তার পকেটে যা ছিল সব হস্তগত করেছি।"

নারায়ণ চোখ ও ভুরু নাচিয়ে বললে, "সত্যি কথাই তো! এতক্ষণ আমার এ খেয়ালটা হয়নি। তবে তুমি কী করতে চাও?"

—"আপাতত নৃপেশের উপরে কড়া পাহারা রাখতে চাই। গোপনে তার পিছনে লেগে থাকলে শত্রুদের আরো অনেক খবর পাবার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু আমাদের দুঃখিত হবার কোনই

কারণ নেই, একদিনেই আমরা যতটা জানতে পেরেছি সেটা অভাবিত সৌভাগ্য বলে মনে করা যেতে পারে। আর এর মূলে আছে প্রধানত আমাদের পকেটমার চ্যালা শ্রীমান বিজয়চন্দ্র। ভাগ্যে সে পকেট কেটেছিল! এজন্যে তাকে ধন্যবাদ দিলেও অন্যায় হবে না।"

নারায়ণ উচ্ছ্বসিত হয়ে বললে, "বিজয় ছোকরাকে কালই আমি নিমন্ত্রণ করে ভালো করে এক-পেট খাইয়ে দেব!"

নরেন ঘাড় নেড়ে বললে, "অতটা বাড়াবাড়ি না করলেও চলবে। পাপীদের উৎসাহিত করলে বিপদের ভয় আছে।"

ঠিক এই সময়ে বাহির থেকে সাড়া এল, "হুজুর ভিতরে যেতে পারি কি?"

—"কে?"

—"আজ্ঞে আমি নসীরাম।"

—"ভিতরে এস। তুমি আবার কী বলতে চাও?"

নসীরাম ঘরে ঢুকে নমস্কার করে বললে, "হুজুর, বিজুর কথায় আজ আমি ব্যারাক-বাড়ির একটা লোকের উপর নজর রেখেছিলুম। বিজু চলে আসবার পরই লোকটা হন্তদন্তের মত বাড়ি থেকে আবার বেরিয়ে এসেই একখানা ট্যাক্সিতে উঠে কোথায় চলে গেল। সেখানে আর কোন ট্যাক্সি ছিল না বলে আমিও তার পিছু নিতে পারলুম না। সেইখানেই চুপ করে বুড়ি ছুঁয়ে বসে রইলুম। তারপর বিজু আবার ফিরে এল। আর সেই লোকটাও খানিকক্ষণ হল ট্যাক্সিতে চড়েই আবার ব্যারাক-বাড়িতে ফিরে এসেছে। কিন্তু এবারে সে একলা নয়, তার সঙ্গে আরো দুজন লোক আছে। এই খবরটা আপনাদের জানাবার জন্যেই বিজু আমাকে এখানে পাঠিয়ে দিলে। এখন আমাদের উপর কী হুকুম হয়?"

—"তোমরা দুজনেই সেই বাড়িখানার উপরে পাহারা দাওগে যাও। খুব সাবধান, লোকটাকে এবারে আর এক মিনিটের জন্যেও চোখের আড়ালে যেতে দিও না।"

নসীরাম ভক্তিভরে আবার একটি নমস্কার ঠুকে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

নরেন আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। তারপর বললে, "নারায়ণ, ব্যাপারটা আন্দাজ করতে পারছ কি?"

—"আবার আমাকে আন্দাজ করতে বলছ? আমি আন্দাজ-ফান্দাজের ধার ধারি না।"

—"কিন্তু, একটা শিশুও এ ব্যাপারটা আন্দাজ করতে পারে। নৃপেশ বাড়িতে ঢুকেই নিজের কাটা পকেট আবিষ্কার করে ফেলেছে, আর তখনই খবর দেবার জন্যে ট্যাক্সিতে চড়ে সেই তিন নম্বরের বাড়িতে তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়েছে। তিন নম্বরের বাসিন্দারা খবর শুনে বোধ করি যথেষ্ট বিচলিত হয়েছে। কিন্তু কেন তারা এতটা বিচলিত হল? তার কারণ কি এই কাঁচের চুড়ি, না এই চিঠিখানা? তাদের চোখে এ দুটোর মধ্যে কোন্‌টা হচ্ছে বেশি মূল্যবান? আর নৃপেশের সঙ্গে যারা এসেছে তারা কে? একসঙ্গে ছোটবাবু আর বড়বাবু নয় তো?"

নারায়ণ মস্ত একটা হাই তুলে মুখের কাছে তুড়ি দিতে দিতে বললে, "ও-সব ঝামেলা নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় আমার নেই। আমার উদরে আবার ক্ষুধার উদ্রেক হয়েছে।"

নরেন রাগ করে বললে, "তোমার বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা নিয়ে তুমি রসাতলে গমন কর! আমি আজ একেবারেই আহার করব না।"

নারায়ণ চক্ষু বিস্ফারিত করে বললে, "আহার করবে না মানে? উপোস করে থাকবে?"

—"ঠিক তাই। তোমাকে তো কতবারই বলেছি, পেট ভরা থাকলে মস্তিষ্কের ধারও ভোঁতা হয়ে থাকে। শূন্য উদর মস্তিষ্ককে দান করে অধিকতর সূক্ষ্ম চিন্তাশক্তি।"

নারায়ণ ক্রুদ্ধস্বরে বললে, "চুলোয় যাক তোমার চিন্তাশক্তি! আমি চাই বাহুবল, আমি চাই পেট-ভরা খোরাক।"

৩
চিঠি আর চুঙি

সেই রাত্রির কথাই বলছি।

নারায়ণ উদরস্থ খাদ্যের ভারে কিঞ্চিৎ কাবু হয়ে নিজের শয়ন-গৃহের ভিতরে অদৃশ্য হল।

নরেন খানিকক্ষণ দোতালার বারান্দার উপরে পায়চারি করে বেড়ালে। তার মুখ দেখেই বোঝা যায়, সে যেন মনে মনে কি চিন্তা করছে। মিনিট কয়েক পরে সে আবার নিচে নেমে গেল। তার বাড়ির পিছন দিকে ছিল ছোট-বড় গাছে ভরা খানিকটা জায়গা। তারা স্থানটিকে বাগান বলেই ডাকত, কিন্তু ও-জায়গাটিকে 'বাগান' আখ্যা দিলে বাগানের মানহানি করা হয়। সেখানে ফুলগাছ চোখে পড়ত না একটাও, কিন্তু আগাছার ছড়াছড়ি ছিল যত্র-তত্র।

নরেন কোথা থেকে একটা বড় চ্যাঙারি সংগ্রহ করে এনে তাদের বাগানের ভিতরে গিয়ে দাঁড়াল। জমির সর্বত্রই পুঞ্জীভূত হয়ে ছিল গাছ থেকে খসে-পড়া শুকনো পাতা। সেই শুকনো পাতাগুলো কুড়িয়ে নিয়ে সে চ্যাঙারির ভিতরে রাখতে লাগল। চ্যাঙারি পূর্ণ হলে পর সেটা নিয়ে আবার বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করলে। তারপরে প্রত্যেক সিঁড়ির উপরে সেই শুকনো পাতাগুলো ছড়াতে ছড়াতে নরেন তাদের দ্বিতল বাড়ির ছাদ পর্যন্ত গিয়ে উঠল। চ্যাঙারি খালি হলে পর সে আবার নেমে ঘরের ভিতরে গিয়ে ঢুকল।

নরেন আর নারায়ণ পাশাপাশি বাস করত দুটি ঘরে। মাঝ-খানের একটি দরজা দিয়ে তারা পরস্পরের ঘরে আনাগোনা করতে পারত।

নরেন নিজের ঘরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই শুনতে পেলে নারায়ণের

বিরাট নাসিকার বিকট গর্জন। সে আগে নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করলে, তারপর মাঝের দরজা দিয়ে প্রবেশ করলে নারায়ণের ঘরে।

এর মধ্যেই নারায়ণ মুখব্যাদান করে গভীর নিদ্রায় অচেতন হয়ে পড়েছে। তার নিদ্রাকে নাম দেওয়া যেতে পারে 'ইচ্ছানিদ্রা'— অর্থাৎ ইচ্ছা করলেই সে একেবারে নিদ্রা-সাগরে তলিয়ে যেতে পারত।

নরেন সেই ঘরের বাইরে যাবার দরজাটির খিল ভিতর থেকে খুলে রাখলে। আবার নিজের ঘরে ফিরে এল। তারপর একখানা ইজি-চেয়ার টেনে এনে এমন জায়গায় রাখলে, যাতে করে সেই চেয়ারে বসে মাঝের দরজা দিয়ে নারায়ণের শয্যাটি ভালো করে দেখা যায়।

নারায়ণের ঘর অন্ধকার। নরেন নিজের ঘরের আলোও নিবিয়ে দিলে। তারপর ইজি-চেয়ারের উপরে বসে হেলান দিয়ে অর্ধশয়ান অবস্থায় স্থির হয়ে রইল।

রাত্রি ক্রমে বাড়ছে, শহরের নানান রকম গোলমাল ক্রমেই কমে আসছে। আরো খানিকক্ষণ কাটল। কলকাতার মুখ প্রায় বোবা হয়ে এল। ... ...টুং, টুং, টুং। ঘরের ঘড়ি জানিয়ে দিলে রাত এখন তিনটে। শহর একেবারে নিসাড়। মাঝে মাঝে কেবল শোনা যায় হঠাৎ একটা প্যাঁচা বা কুকুরের চিৎকার। বাতাসে বাজছে যেন ঝিম্ ঝিম্ ঝিম্ নীরবতার বীণা এবং তারই মধ্যে ফাঁক পেয়ে নিজের অস্তিত্বকে ভালো করে জানিয়ে দেবার চেষ্টা করছে ঘরের ঘড়ির টিক্ টিক্ টিক্ শব্দ।

ঘরে ঘরে ঘুমোচ্ছে শহরের জীবরা। কিন্তু নরেন তখনো সম্পূর্ণরূপে জাগ্রত—তার চক্ষে ঘুমের এতটুকু আমেজ নেই।

আরো কিছুক্ষণ কাটল। নরেন যখন ভাবছে আজকের মত অনিদ্রাকে বরণ করা বোধহয় ব্যর্থ হয়ে গেল, তখন হঠাৎ সে সচমকে চেয়ারের উপরে সোজা হয়ে উঠে বসল।

তার কান যা শুনতে চাইছিল, শুনতে পেয়েছে তা। এক রকম শব্দ হচ্ছে—মড়্ মড়্, মড়্ মড়্। কেউ যেন শুকনো পাতা মাড়িয়ে দোতালার ছাদের সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে আসছে।

উৎকর্ণ হয়ে নরেন বসে রইল পাথরের পুতুলের মতন। সিঁড়ির উপর শুকনো পাতার আর্তনাদ। তার মুখ দেখলে মনে হয়, এই পত্রমর্মর তার কানে করছে যেন মধুবৃষ্টি! অল্পক্ষণ পরে সব চুপচাপ।

তারপরেই শোনা গেল একটা কর্কশ শব্দ—যেন কেউ ধীরে ধীরে ঠেলে ও-ঘরের একটা দরজা খুলছে এবং আওয়াজ হচ্ছে তার তৈলহীন কব্জা থেকে। নরেন জানত, ও-ঘরের দরজা কেউ নিঃশব্দে খুলতে পারে না। তাই সে আজ নিজের হাতেই নারায়ণের ঘরের দরজার খিল খুলে রেখে এসেছে। সে আগেই অনুমান করেছিল, আজ এখানে কারুর ভয়াবহ আবির্ভাবের সম্ভাবনা আছে। এতক্ষণে বোঝা গেল, তার অনুমান মিথ্যা নয়।

নরেন উঠে দাঁড়াল এবং বাঁ-হাত বাড়িয়ে নিজের ঘরের ইলেকট্রিক সুইচের উপরে আঙুল রাখলে। তার ডান হাতে একটি ছোট্ট রিভলভার। তারপর সে শ্বাস রুদ্ধ করে অপেক্ষা করতে লাগল।

দরজা তখনো কার হাতের ঠেলার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছে। তারপর দরজা হল নীরব। নরেন আরো আধ মিনিট অপেক্ষা করলে, তারপর হঠাৎ টিপে দিলে তার ঘরের আলোর সুইচটা। এ-ঘরের আলোটা ছিল এমন জায়গায় যে, সেটা জ্বললেই তার খানিকটা শিখা মাঝের দরজা দিয়ে ও-ঘরের ভিতরে গিয়ে পড়ে।

আলো জ্বেলেই নরেন দেখলে, নারায়ণের শয্যাশায়ী দেহের উপরে ঝুঁকে রয়েছে একটা মূর্তি এবং তার উদ্যত হাতে একখানা মস্ত চকচকে ছোরা।

পরমুহূর্তেই ছোরাখানা বোধহয় নারায়ণের বক্ষ ভেদ করত, কিন্তু নরেন হত্যাকারীকে অস্ত্র ব্যবহারের কোনই সুযোগ দিলে না, লক্ষ্য স্থির করেই সে নিজের রিভলভারের ঘোড়া টিপে দিলে।

গুলিটা গিয়ে লাগল ও-ঘরের দেওয়ালের উপরে। সচকিত মূর্তিটা হল বিদ্যুতের মত অদৃশ্য। এবং রিভলভারের গর্জনে ঘুম ভেঙে গেল নারায়ণের। প্রথমটা সে হতভম্বের মত চারিধারে তাকাতে লাগল। তারপর খাটের নিচে লাফিয়ে পড়ে বলে উঠল, "কী হয়েছে নরেন? তুমি রিভলভার ছুঁড়লে কেন?"

নরেন শান্তভাবে সহজ স্বরে বললে, "তোমায় বাঁচাবার জন্যে।"

—"সে আবার কী?"

—"আর একটু হলেই খুনীর ছোরা বিঁধত তোমার বুকে।"

—"আমি কিছুই বুঝতে পারছি না!"

—"বোঝাবুঝি পরে হবে—এখন শীঘ্র আমার সঙ্গে এস। সিঁড়ির উপরে পাতার শব্দ শুনেই বুঝেছি, খুনী আবার ছাদের দিকে উঠে গিয়েছে।" বলেই নরেন বেগে ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে গেল এবং নারায়ণও ছুটল তার পিছনে পিছনে।

ছাদে উঠে নরেন পকেট থেকে টর্চ বার করে চারিদিকে আলোক নিক্ষেপ করতে লাগল, কিন্তু কোথাও কারুকে দেখা গেল না।

নরেন বললে, "বুঝেছি। এইদিকে এস।" সে দৌড়ে ছাদের একদিকে গিয়ে দাঁড়াল, তারপর মুখ বাড়িয়ে নিচের দিকে আলো ফেলে দেখলে, ছাদের জল বেরুবার লোহার পাইপ ধরে একটা মূর্তি নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে।

নারায়ণ মুখ বাড়িয়ে দেখলে। তারপরেই প্রচণ্ড এক হুঙ্কার দিয়ে সেও তাড়াতাড়ি পাইপ ধরে নিচের দিকে নামতে গেল। নরেন টপ্ করে তার একখানা হাত চেপে ধরে বললে, "কর কী নারায়ণ, কর কী! তোমার ঐ বিপুল দেহের ভার এই তুচ্ছ পাইপটা কি সহ্য করতে পারবে? তুমি কি পাগল হয়েছ?"

তার কথা শেষ হতে না হতেই রাস্তার উপরে জাগল বিষম এক আর্তনাদ। কে চেঁচিয়ে উঠল—"খুন করলে, আমাকে খুন করলে! হুজুর, আমাকে রক্ষা করুন!"

—"সর্বনাশ, এ যে বিজয়ের গলা!" বলেই নরেন আবার ছাদের আলসের উপরে হুমড়ি খেয়ে পড়ে মুখ বাড়িয়ে রাস্তাটা দেখবার চেষ্টা করলে!

কিন্তু নিশ্চন্দ্র আকাশ ও ব্ল্যাক আউটের রাত্রি। দৃষ্টিকে অন্ধ করে দেয় রন্ধ্রহীন অন্ধকার। তবু যাতে কারুর গায়ে না লাগে এমনভাবে নরেন আবার বার-দুয়েক রিভলভার ছুঁড়লে—হত্যাকারীকে ভয় দেখাবার জন্যে। তারপর টর্চের আলো রাস্তার উপরে ফেলে দেখলে, ধুলোয় শুয়ে ছটফট করছে একটা মূর্তি। সেখানে আর কারুকে দেখা গেল না, হত্যাকারী নিশ্চয়ই পলায়ন করেছে।

নরেন বললে, "নিচে নেমে চল নারায়ণ, দেখি বিজয়ের আবার কী হল!"

দুজনে দ্রুতপদে সেই শুষ্ক পর্ণে পরিপূর্ণ সোপানকে শব্দিত করতে করতে নেমে এল একতালায়। তারপর সদর দরজা খুলে রাস্তায় গিয়ে পড়ল।

বিজয়ের ক্ষীণ স্বর শোনা গেল, "হুজুর, আর আমি বাঁচব না!"

নরেন বললে, "নারায়ণ, টর্চটা ধর তো, আমি একবার বিজয়কে পরীক্ষা করে দেখি!"

নরেন টর্চটা নিয়ে বিজয়ের উপরে আলো ফেলে দেখলে, তার মুখ যন্ত্রণাবিকৃত এবং তার কাপড়-চোপড়ে রক্তের দাগ।

নরেন লক্ষ্য করলে বিজয় ছোরার ঘা খেয়েছে কাঁধের উপরে। অল্পক্ষণ ক্ষতস্থানটি পরীক্ষা করে সে বললে, "ভয় নেই বিজয়, এ-যাত্রা তোমাকে মরতে হবে না। তোমার আঘাত সাঙ্ঘাতিক নয়।"

বিজয় কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত স্বরে বললে, "ঠিক বলছেন হুজুর? আপনি আমাকে মিথ্যা প্রবোধ দিচ্ছেন না তো?"

—"না বিজয়, আমার কথা বিশ্বাস কর। কিন্তু তুমি এখানে কেন?"

বিজয় আস্তে আস্তে উঠে বসে বললে, "আপনার হুকুম তামিল করবার জন্যেই আমাকে এখানে আসতে হয়েছে।"

—"সংক্ষেপে সব কথা গুছিয়ে বল।"

—"হুজুর বলেছিলেন, নৃপেশকে আমি যেন একবারও চোখের আড়াল না করি। আমি সেই ব্যারাক-বাড়ির দিকে চোখ রেখে চুপ করে বসে ছিলুম। হঠাৎ দেখলুম, অনেক রাতে দুটো লোক ছায়ার মতন সেই বাড়ির ভিতর থেকে বেরিয়ে এল। তখন চারিদিকে ঘুটঘুট করছে অন্ধকার, তারা যে কারা, কিছুই বুঝতে পারলুম না। তারপরই একটা লোক সিগারেট ধরাবার জন্যে দেশলাইয়ের কাঠি জ্বাললে, আর সেই আলোতে দেখা গেল নৃপেশের মুখখানা। তারপর তারা অন্ধকারে আবার মিলিয়ে গেল, কেবল শোনা যেতে লাগল তাদের পায়ের জুতোর শব্দ। সেই শব্দ শুনতে শুনতেই আমি তাদের পিছু নিলুম। এপথ-ওপথ ঘুরে শেষটা তারা এসে দাঁড়াল আপনাদের এই বাড়ির কাছে। তারপর তাদের পায়ের শব্দ থেমে গেল। তারা যে অন্ধকারে কী করছে না করছে কিছুই বুঝতে না পেরে আমি চুপ করে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে রইলুম। এগুতে ভরসা হল না, পাছে তাদের গায়ের উপর গিয়ে পড়ি। এমনিভাবে খানিকক্ষণ কাটল। তারপর হঠাৎ বাড়ির ভিতরে শুনলুম রিভলভারের আওয়াজ। আমি তো ভয়ে একেবারে হতভম্ব হয়ে গেলুম, ব্যাপারটা কিছুই আন্দাজ করতে পারলুম না। তার খানিক পরেই দেখলুম, ছাদের ধারে জ্বলে উঠেছে আপনার টর্চের আলো আর জলের নল ধরে তড়-বড় করে নিচের দিকে নেমে আসছে একটা লোক। রাস্তায় পড়েই লোকটা ছুটতে লাগল আর সঙ্গে সঙ্গে আমারও হুঁস হল। সে যেই আমার সামনে এসে পড়ল, আমি তখনি তাকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরলুম। খানিকক্ষণ ঝটাপটির পরেই লোকটা আমাকে ছুরি মেরে আমার হাত ছাড়িয়ে আবার পালিয়ে গেল।"

নারায়ণ ক্রুদ্ধ স্বরে গর্জন করে বললে, "ব্যাটা যদি পড়ত আমার হাতে, তাহলে ছোরাশুদ্ধ হাতখানা ঢুকিয়ে দিতুম তার পেটের ভিতরে। একেবারে কীচক-বধ করে ছাড়তুম।"

নরেন একটু চুপ করে থেকে বললে, "বিজয়, তুমি ঠিক দেখেছ তো, আমার বাড়ির সামনে একজন নয়, দুজন লোক এসে দাঁড়িয়েছিল ?"

বিজয় বললে, "অন্ধকারে ঠিক দেখেছি কি না কী করে বলব হুজুর ! তবে, এইটুকু শুনেছি, দু-জোড়া পায়ের শব্দ আপনার বাড়ির সামনে এসেই থেমে গিয়েছিল।"

নরেন ভাবতে ভাবতে বললে, "তাহলে আর-একটা লোক কোথায় গেল ?"

নারায়ণ বললে, "ও-সব কথা পরে ভাবলেও চলবে। বিজয়ের ক্ষতস্থান দিয়ে এখনো রক্ত বেরুচ্ছে, আগে ও-জায়গাটা ব্যাণ্ডেজ দিয়ে বেঁধে রাখা দরকার।" বলেই সে হাত বাড়িয়ে বিজয়ের দেহ পথ থেকে তুলে নিলে শিশুর মত।

বিজয়ের ক্ষতস্থান ধুয়ে ও বেঁধে দিয়ে একটা ঘরে তাকে সে-রাতের মত শুইয়ে রেখে তারা দুজনে আবার উপরে গিয়ে উঠল।

নরেন নিজের ঘরে ঢুকেই দেখলে, চারিদিকে একটা বিশৃঙ্খলার দৃশ্য এবং তার বড় টেবিলের দেরাজগুলো সব খোলা। সে ছুটে গিয়ে একটা খোলা দেরাজের ভিতরে হস্ত সঞ্চালন করে ফিরে দাঁড়িয়ে বললে, "নারায়ণ, আমার ঘরেও চোর এসেছিল।"

—"সেকি! কখন এল ?"

—"খুব সম্ভব একটা লোক নল বেয়ে উঠেছিল ছাতের উপরে, আর একটা লোক রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছিল পাহারা দেবার জন্যে। প্রথম লোকটা বিজয়কে ছোরা মেরে পালিয়ে যাবার পর আমরা যখন সদর খুলে রাস্তায় আসি, দ্বিতীয় লোকটা সেই সময়ে আঁধারে গা-ঢাকা দিয়ে বাড়ির ভিতরে এসে ঢুকেছিল। তারপর আমরাও রইলুম বিজয়কে নিয়ে ব্যস্ত, আর সেও আমার ঘরে ঢুকে কাজ হাসিল করে আবার দিলে লম্বা। নারায়ণ, এ হচ্ছে অসম্ভব-রকম দুঃসাহসী চোর। চোর যে কে, তাও আমি আন্দাজ করতে পারছি।"

—"কে সে?"

—"নৃপেশ ছাড়া আর কেউ নয়।"

—"কেমন করে জানলে?"

—"বিজয় স্বচক্ষে দেশলাইয়ের আলোতে দেখেছে নৃপেশের মুখ। কিন্তু আমি দেখেছি, ছোরা উঁচিয়ে তোমার বুকের উপরে যে-লোকটা ঝুঁকে দাঁড়িয়েছিল, সে নৃপেশ নয়। সুতরাং বেশ বোঝা যাচ্ছে, যে-লোকটা রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছিল, সেই-ই হচ্ছে নৃপেশ।"

—"কিন্তু সে কী চুরি করে পালিয়ে গিয়েছে?"

নরেন চেয়ারের উপরে বসে পড়ে বললে, "সেই কাঁচের চুড়ি আর চিঠিখানা।"

নারায়ণ খুশি হয়ে বললে, "বাঁচা গেল! কাঁচের চুড়ি আর চিঠি নিয়ে আমাদের আর মাথা ঘামাবার দরকার নেই! আমি ভেবেছিলুম, চোর ব্যাটা বুঝি কোন দামি জিনিস নিয়ে সরে পড়েছে।"

চেয়ারের হাতলের উপরে আঙুল দিয়ে মৃদু আঘাত করতে করতে নরেন বললে, "উঁহু, তোমার কথা মানতে পারলুম না। ও-দুটো জিনিস নিশ্চয়ই মূল্যবান। নইলে ও-দুটোর জন্যে ওদের এতটা মাথাব্যথা হবে কেন? হয়ত ঐ চুড়ি আর চিঠি যে আমাদের হাতেই পড়েছে, ওরা নিশ্চিতরূপে সে-কথা জানত না। হয়ত ওরা এসেছিল আমাদের পৃথিবী থেকে সরাবার জন্যে, তারপর দৈবগতিকে পথ খোলা পেয়ে নৃপেশ বাড়ির ভিতরে ঢুকে দেখতে এসেছিল তার সন্দেহ সত্য কি না—অর্থাৎ চুড়ি আর চিঠি আমাদের কাছে আছে কি না।"

—"তাহলে তুমি জানতে যে ওরা আজ এখানে আসবে?"

—"জানতুম বলা ঠিক হবে না, তবে আন্দাজ করেছিলুম আজ-কালের মধ্যেই ওদের এখানে আসবার সম্ভাবনা আছে।"

নারায়ণ মাথা নেড়ে বললে, "আশ্চর্য তোমার আন্দাজ! এ-রকম আন্দাজের অর্থ খুঁজে পাওয়া যায় না।"

নরেন দৃঢ়স্বরে বললে, "নিশ্চয়ই পাওয়া যায়! এইটুকু মনে

রেখো, এরা সাধারণ অপরাধী নয়। এরা হচ্ছে শত্রুপক্ষের গুপ্তচর। বাংলাদেশের ভিতরে এরা একটা প্রকাণ্ড দল গঠন করেছে। এরা জানে, খুব গোপনে আর তাড়াতাড়ি কাজ করতে না পারলে ধরা পড়তে হবে, আর ধরা পড়লে সকলকেই চড়তে হবে ফাঁসিকাঠে। আমার দৃঢ় ধারণা, ঐ চিঠি আর চুণ্ডির ভিতরেই এই মামলাটার সমস্ত রহস্যের চাবি লুকোনো আছে। ওরা যে মুহূর্তে সন্দেহ করতে পারলে যে এই মামলাটা তদারক করবার জন্যে নিযুক্ত হয়েছি আমরা আর মামলার ভার পেয়েই আমরা হস্তগত করেছি ওদের বধ করবার ব্রহ্মাস্ত্র, সেই মুহূর্তেই স্থির করে ফেললে, ভিতরের কথা প্রকাশ পাবার আগেই অত্যন্ত তাড়াতাড়ি হয় আমাদের পথ থেকে সরাতে হবে, নয় চিঠি আর চুণ্ডি পুনরুদ্ধার করতে হবে। ওদের প্রথম উদ্দেশ্য সফল হয় নি, কিন্তু দ্বিতীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে—চিঠি আর চুণ্ডি গিয়েছে আবার ওদের পকেটেই। নারায়ণ, এখন বুঝতে পারছ, কেন আমি আন্দাজ করেছিলুম যে আমাদের বাড়িতে আসতে ওরা বিলম্ব করবে না?"

—"হুঁ, তুমি বুঝিয়ে দিলে, তাই বুঝলুম। কিন্তু আর একটা ব্যাপার এখনো বোঝা যাচ্ছে না। চিঠিখানা আমি পড়ে দেখেছি, কিন্তু ঐ চুণ্ডির ভিতরে কী আছে সেটা তুমি জানতে পেরেছ কি?"

—"পরীক্ষা করে জানতে পেরেছি বৈকি।"

—"কী জেনেছ শুনি?"

রহস্যময় হাসি হেসে নরেন বললে, "এখনো তোমাকে বলবার সময় হয় নি।"

নারায়ণ চটে বললে, "তুমি চুলোয় যাও!"

৪
ডাক্তার চন্দ্রনাথ ঘোষ

দিন-তিনেক পরেকার কথা। ডন-বৈঠক দেওয়া এবং মুগুর ভাঁজা শেষ করে নারায়ণ বারান্দার উপরে হাত-পা ছড়িয়ে বসে হাঁপ ছাড়ছিল। এমন সময়ে নরেনের আবির্ভাব। নারায়ণ ভুরু কুঁচকে বিরক্ত কণ্ঠে বললে, "আজ তিন দিন ধরে দেখছি, আমাকে ফাঁকি দিয়ে তুমি একলাই হাওয়া খেতে যাচ্ছ।"

নরেন বললে, "হাওয়া খেতে নয় ভাই, কিছু-কিছু খোঁজ-খবর নিতে।"

—"কিসের খোঁজ-খবর? পঞ্চম-বাহিনীর?"

—"তাছাড়া আবার কী?"

নারায়ণ মেঝের উপরে সজোরে একটা চপেটাঘাত করে ক্রুদ্ধ স্বরে বললে, "না না, এ-সব ব্যাপারে তোমার একলা যাওয়া কিছুতেই চলতে পারে না!"

—"কেন?"

—"ওরা হচ্ছে ভয়ানক বিপদজনক লোক। একলা ওদের হাতে পড়লে কিছুতেই তুমি আর বেঁচে ফিরে আসবে না। তুমি যত-বড় চালাক লোকই হও না কেন, হাতাহাতির সময় তুমি হচ্ছ একটি সামান্য শিশু। তোমার রক্ষাকর্তা হতে পারি একমাত্র আমি। এর পরে আমাকে ছেড়ে তুমি রাস্তায় এক পা বেরুতে পারবে না।"

নরেন হেসে বললে, "তথাস্তু। কিন্তু ভায়া, আর একটা কথাও ভেবে রেখো। যে দলের পিছনে আমরা লেগেছি, সে দলে গুণ্ডা আর ডাকাতও থাকতে পারে, আর সময়ে-সময়ে তারা গায়ের

জোর বা সাধারণ অস্ত্র চালিয়েও নরহত্যা করতে পারে বটে, কিন্তু তাদের দলপতির নরহত্যার আসল পদ্ধতি হচ্ছে আরো সূক্ষ্ম। সেখানে তোমার ও গায়ের জোর কোন কাজেই আসবে না।"

—"তাই নাকি ?"

—"হ্যাঁ। এই রকমই আমি আন্দাজ করছি।"

—"নরেন, তোমার আন্দাজের ধাক্কা সহ্য করা ক্রমেই আমার পক্ষে কঠিন হয়ে উঠছে। তোমাকে নিয়ে আর আমি পারব না, তুমি স্তব্ধ হও।"

—"উত্তম। তোমাকে একটা খবর দিয়েই আমি মৌনব্রত অবলম্বন করব।"

—"কী খবর ?"

বারান্দার কোণ থেকে একটা মোড়া টেনে নিয়ে নারায়ণের সামনে বসে পড়ে নরেন বললে, "তুমি জান, এই মামলায় আমার আগে আরো তিনজন গোয়েন্দা একই নিউমোনিয়া রোগে মারা পড়েছে ? আমি খবর নিয়ে জানলুম যে ঐ তিন গোয়েন্দারই চিকিৎসার ভার পেয়েছিল একই ডাক্তার।"

সামনের একখানা রেকাবি থেকে একমুঠো ভিজে ছোলা তুলে নিয়ে নারায়ণ বদন-গহ্বরে নিক্ষেপ করলে। তারপর চর্বণ করতে করতে বললে, "তাতে হয়েছে কী ?"

—"হয়ত বিশেষ কিছুই নয়। ডাক্তারটির নাম চন্দ্রনাথ ঘোষ, বিলেত-ফেরত। ডাক্তারটি একবার জাপানও বেড়িয়ে এসেছেন। পুলিশ-মহলে তাঁর বিশেষ খ্যাতি। তাই পুলিশ বিভাগের অনেকেই অসুখে পড়লে তাঁকেই আহ্বান করে। এটা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু অস্বাভাবিক হচ্ছে একটি ব্যাপার।"

—"কী ?"

—"একই নিউমোনিয়া রোগে তিন গোয়েন্দার মৃত্যু, আর একই ডাক্তার চন্দ্রনাথ ঘোষের চিকিৎসা।"

নারায়ণ একটু ভেবে বোঝবার চেষ্টা করে বললে, "আমি তো এর মধ্যে অস্বাভাবিক কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। হয়ত কলকাতায় নিউমোনিয়া রোগের প্রাদুর্ভাব হয়েছে।"

—"না, তা হয়নি। সে খোঁজও আমি নিয়েছি। কলকাতায় এখন নিউমোনিয়া রোগের বাড়াবাড়ি নেই। আর বাড়াবাড়ি হলেও পরে-পরে একই মামলায় নিযুক্ত তিনজন গোয়েন্দাই যদি একই ডাক্তারের চিকিৎসাধীন হয়ে নিউমোনিয়ায় মারা পড়ে, তাহলে শুনতে যেন কেমন-কেমন লাগে না কি?"

নারায়ণ হতাশভাবে মাথা নেড়ে বললে, "বন্ধু, তুমি একটি মূর্তিমান হেঁয়ালি। তোমার কথা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।"

—"বুঝেও কাজ নেই। তোমার সঙ্গে পরামর্শ করতে যাওয়া হচ্ছে ডাহা বোকামি।" উঠে দাঁড়িয়ে এই কথাগুলো বলতে বলতে নরেন নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকল।

সে জামা-কাপড় ছেড়ে সবে বসেছে, এমন সময় এসে হাজির হলেন শচীনবাবু। আসন গ্রহণ করবার আগেই তিনি প্রশ্ন করলেন, "মামলাটার কোন হদিশ করতে পারলেন?"

নরেন বললে, "কী যে বলেন! এত বড় একটা মামলা, আপনাদের মতন মস্ত মস্ত সব মাথা থাকতেও তিন বেচারা গোয়েন্দার প্রাণ গেল, আর আমি এর মধ্যেই কিনারায় গিয়ে পৌঁছব? তাও কখনো হয়!"

শচীনবাবু একখানা আসনের উপরে অঙ্গভার ন্যস্ত করে হাসতে হাসতে বললেন, "ভগবান সহায় থাকলে সবই হতে পারে নরেনবাবু! আমরা এখনো মামলাটার ঠিক কিনারা না করতে পারলেও ভাগ্য-গুণে হঠাৎ দু-একটা গুপ্ত কথা জানতে পেরেছি।"

জিজ্ঞাসু চোখে শচীনবাবুর দিকে তাকিয়ে নরেন বললে, "হঠাৎ?"

—"হ্যাঁ, হঠাৎ। একরকম দৈবগতিকে আর কি! ব্যাপারটা শুনবেন?"

—"নিশ্চয়ই।"

—"যেখানে বাঘের ভয় সেইখানেই সন্ধে হয়। আজ সকালে আমার এক বন্ধুকে ফোন করে শুনলুম অচেনা দু-জন লোকের গলা। অর্থাৎ cross connection আর কি! প্রথম ব্যক্তি বলছে, 'ছোটবাবু, নর-নারায়ণকে আপনি বোধহয় এখনো ভালো করে চেনেন নি। তারা যে মামলার ভার হাতে নেয়, তার শেষ পর্যন্ত না দেখে ছাড়ে না।' দ্বিতীয় ব্যক্তি বললে, 'নৃপেশ, থো কর তোমার নর-নারায়ণের কথা! আমিও তাদের শেষ না করে ছাড়ব না।' নৃপেশ নামধারী ব্যক্তি বললে, 'তাহলে আমার উপরে কী হুকুম হয় বলুন।' ছোটবাবু বললে, 'আসছে অমাবস্যার রাত্রে ঠিক বারোটার সময় চার নম্বরের বাড়িতে একটা বড় পরামর্শ-সভার আয়োজন করা হচ্ছে। সেই সভায় আমাদের দলের সবাইকে যোগ দিতে হবে। তোমরাও যেন ভুলো না।' নৃপেশ বললে, 'আমাদের বড়বাবুও কি সেখানে হাজির থাকবেন?' ছোটবাবু বললে, 'নিশ্চয়ই। তিনিই তো সভা আহ্বান করেছেন, আর সভাপতি হবেন তিনিই।' নৃপেশ খুশি-গলায় বললে, 'তাহলে এতদিন পরে বড়বাবুকে আমরা সামনাসামনি দেখতে পাব?' ছোটবাবু বললে, 'মূর্খ! আমি ছাড়া আমাদের দলের আর কেউ বড়বাবুর মুখ দেখেনি, কখনো দেখতেও পাবে না। বড়বাবু সভায় আসবেন বটে, কিন্তু তাঁর মুখ ঢাকা থাকবে কালো কাপড়ের মুখোসে। খালি বড়বাবু নয়, তোমাকে আমাকে আর অন্য সবাইকেও সেদিনকার সভায় যেতে হবে মুখোসে মুখ ঢেকে। যথাসময়ে আমাদের সবাইকেই এক একটি মুখোস উপহার দেওয়া হবে।' নৃপেশ বললে, 'নিজেদের আস্তানায় এতটা লুকোচুরির কারণ কী ছোটবাবু?' জবাব হল, 'নৃপেশ, আমরা যে-কাজে নেমেছি, তাতে পদে পদে মৃত্যু-ভয়। আমাদের দলে লোক অনেক। ভয়ে বা অর্থলোভে বা বাধ্য হয়ে হয়ত কেউ বিশ্বাসঘাতকও হতে পারে। সেইজন্যেই এই সাবধানতা। বড়বাবু চান না যে, তাঁর দলের লোকেরা পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত হয়। তোমরা আসবে, কেউ

কারুকে চিনবে না, অথচ এক জায়গায় বসে বড়বাবুর সমস্ত উপদেশ শুনতে পাবে।' নৃপেশ বললে, 'বড়বাবুর হুকুম তো আপনার মুখ থেকে আমরা সর্বদা শুনতে পাই। তবে হঠাৎ এত-বড় সভার আয়োজন কেন?' ছোটবাবু বললে, 'নৃপেশ, তুমি জানো, বড়বাবুর কি আমার সামনে তোমাদের কারুর কোনই প্রশ্ন করার অধিকার নেই। তুমি আমাদের অত্যন্ত বিশ্বস্ত লোক বলেই তোমার এই মুখরতা ক্ষমা করলুম। সভা আহ্বান করবার কারণ নিশ্চয়ই আছে। আমাদের বন্ধু জাপানিরা যে ভারতবর্ষ আক্রমণ করতে আসছে, খবরের কাগজে একথা অবশ্যই তুমি পাঠ করেছ। জাপানিরা ভারতবর্ষের মাটিতে পা দিলেই আমাদের কী করতে হবে জান? তখন আমাদের—'......এইখানেই দুর্ভাগ্যক্রমে cross connection-এর পালা হঠাৎ সাঙ্গ হয়ে গেল। নরেনবাবু, সবটা শুনতে না পেয়ে আমি অত্যন্ত দুঃখিত হলুম বটে, তবু যতটুকু শুনেছি তাই-ই কি যথেষ্ট নয়?"

ইতিমধ্যে নারায়ণ ঘরের মধ্যে এসে হাঁ করে শচীনবাবুর কথাগুলো যেন ভক্ষণ করছিল। সে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে উঠল, "নিশ্চয়ই যথেষ্ট! না, যথেষ্টরও বেশি!"

নরেন ভাবহীন মুখে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল। তারপর ধীরে ধীরে আপন মনেই বললে, "আসছে অমাবস্যার রাত বারোটার সময়। তার মানে, ঠিক আর সাত দিন পরে। চার নম্বরের বাড়ির কথা আমরাও জানি, কিন্তু তার ঠিকানা কোথায়?"

শচীনবাবু বিস্মিত স্বরে বললেন, "চার নম্বরের বাড়ির কথা আপনারাও জানেন?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ। খালি চার নম্বরের নয়, তিন নম্বরের বাড়ির কথাও জানি—তার ঠিকানাও আমাদের অজানা নেই।"

—"তাহলে এ মামলার ভিতরে আপনারাও খানিকটা অগ্রসর হয়েছেন? কিছু-কিছু সূত্রও পেয়েছেন?"

—"হ্যাঁ, কিছু-কিছু পেয়েছি বটে। ঐ নৃপেশ বাবাজির সঙ্গে আমরা সুপরিচিত, ছোটবাবুর নামও আমরা শুনেছি, আর বড়বাবুর অস্তিত্বও আমরা কল্পনা করেছি।"

শচীনবাবু দুই চক্ষু বিস্ফারিত করে বললেন, "বটে, বটে, বটে! অথচ এমন সব জবর খবর এখনো আমাকে দেন নি?"

—"এখনো দেবার সময় হয়নি শচীনবাবু। এতক্ষণ আমরা দুজনে ছিলুম ত্রয়াঙ্ক নাটকের প্রথম অঙ্কে। আপনার cross connection-এর মহিমায় এখন আমরা এসে পড়েছি দ্বিতীয় অঙ্কে। এইবারে আশা করছি তৃতীয় অঙ্কের শেষে গিয়ে যবনিকা ফেলতে আর আমাদের বেশি দেরি লাগবে না। কী বল হে নারায়ণ?"

নারায়ণ মস্তকান্দোলন করে বললে, "ধেৎ, আমি কিছুই বলি না। যতক্ষণ-না ব্যাটাদের মুণ্ডুগুলো হাতের কাছে পাই ততক্ষণ আমি এক্কেবারে বোবা হয়ে থাকতে চাই। আমি কথার মানুষ নই, আমি হচ্ছি কাজের মানুষ!"

শচীনবাবু কি বলতে যাচ্ছিলেন, নরেন আচম্বিতে চেয়ারের উপরে হেলে পড়ে নিজের বুকের উপরে হাত রেখে যন্ত্রণাবিকৃত স্বরে বলে উঠল, "উঃ!"

শচীনবাবু ব্যস্ত হয়ে বললেন, "কী হয়েছে নরেনবাবু? অমন করছেন কেন?"

নরেন দুই চোখ মুদে ক্ষীণস্বরে বললে, "কেন জানি না বোধহয় আমার বিষম সর্দি লেগেছে। বুকে দারুণ ব্যথা! মাঝে মাঝে যাতনা আর সহ্য করতে পারছি না!"

নারায়ণ বিস্মিত কণ্ঠে বললে, "কই নরেন, তোমার অসুখের কথা তো এতক্ষণ আমাকে বল নি?"

নরেন তেমনিভাবেই বললে, "ইচ্ছা করেই বলিনি। কারণ আমি জানি তুমি একটুতেই অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠ। সমস্ত অসুখ আমি চেপে রাখতে চেয়েছি, অথচ আমার নিশ্বাস ফেলতেও কষ্ট হচ্ছে।"

শচীনবাবুর দুই চক্ষে রীতিমত আতঙ্কের ভাব ফুটে উঠল। তিনি ব্যস্তকণ্ঠে বললেন, "আপনার এতই যদি অসুখ, তাহলে ডাক্তার ডাকান নি কেন ?"

নরেন বললে, "হ্যাঁ, আমার ডাক্তার ডাকাই উচিত ছিল। কিন্তু যে-সে ডাক্তারকে ডাকতে আমার ভয় হয়। আমাদের কাকে ডাকা উচিত বলুন দেখি শচীনবাবু ?"

—"কেন, আমাদের চন্দ্রনাথকে ডাকুন না। পুলিশের অনেকেই বলে, তার মতন ভাল ডাক্তার খুব কমই আছে।"

—"চন্দ্রনাথবাবুকে আপনি কতদিন জানেন ?"

—"বহুকাল থেকেই। মাঝে কিছুদিনের জন্যে সে বর্মায় গিয়েছিল।"

—"কেন ?"

—"এক ধনী রোগীর আহ্বানে। এমনি তার দুর্ভাগ্য, ঠিক সেই সময়েই জাপানিরা বর্মা আক্রমণ করে। তার পর থেকে কিছুদিন চন্দ্রনাথের আর কোন খোঁজ পাওয়া গেল না, আন্দাজ করলুম সে জাপানিদের হাতে বন্দী হয়েছে। তারপর হঠাৎ একদিন আবার চন্দ্রনাথের দেখা পেলুম। আমরা সবাই তো অবাক! কিন্তু চন্দ্রনাথ বললে, জাপানিরা রেঙ্গুন দখল করবার আগেই সেখান থেকে সে পালিয়ে যায়, তারপর বর্মা থেকে পায়ে-হাঁটা পথ ধরে অনেক বন জঙ্গল পাহাড় নদী পার হয়ে বহু বিপদ এড়িয়ে আবার ভারতবর্ষে এসে উপস্থিত হতে পেরেছে। তার মুখে জাপানিদের নিষ্ঠুরতার যে-সব বর্ণনা শুনেছি, তা শুনলে আপনার গায়ে কাঁটা দেবে।"

নরেন বললে, "চন্দ্রনাথবাবু জাপানিদের উপরে নিশ্চয়ই খুব চটে আছেন ?"

—"সে কথা আর বলতে ? জাপানিদের কাছে পেলে চন্দ্রনাথ বোধহয় খালি হাতেই মাথা কেটে ফেলে!"

—"চন্দ্রনাথবাবু বুঝি সর্বদাই জাপানিদের নিন্দা করেন ?"

—জাপানিদের নিন্দা ছাড়া তার মুখে কথাই নেই। এইটেই স্বাভাবিক। জাপানিদের জন্যে তাকে তো কম কষ্টভোগ করতে হয়নি! তাকে ডাকলে আপনিও তার মুখে জাপানিদের অনেক কথাই শুনতে পাবেন। চন্দ্রনাথকে খবর দেব কি?"

—"শচীনবাবু, আমার ভয় হচ্ছে, আমারও বোধহয় নিউমোনিয়া হবে। কলকাতায় হয়ত নিউমোনিয়া এবারে মারাত্মক রূপে দেখা দেবে। কারণ ইতিমধ্যেই আপনার নিযুক্ত আরো তিন ভদ্রলোক এই রোগে মারা গিয়েছেন। আর আমি শুনেছি ডাক্তার চন্দ্রনাথ ঘোষই চিকিৎসা করেও ঐ তিনজন লোককে বাঁচাতে পারেন নি। তাঁর উপরে আমার চিকিৎসার ভার দিলে কোন বিপদ হবে না তো?"

—"নরেনবাবু, জন্ম আর মৃত্যু ভগবানের হাত, ডাক্তাররা হচ্ছেন নিমিত্ত মাত্র। পরমায়ু ফুরুলে ডাক্তাররা কারুকেই বাঁচাতে পারে না।"

নরেন অধিকতর ক্লিষ্ট কণ্ঠে বললে, "সে-কথা আমিও মানি। বেশ, তবে চন্দ্রবাবুকেই খবর দিন।"

নারায়ণ হঠাৎ চিৎকার করে বলে উঠল, "না, না, না! ঐ চন্দ্রবাবুকে ডাকা হতেই পারে না! ওরই হাতে পড়ে তিনজন—" ....বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গেল, কারণ সে আরো কিছু বলবার আগেই নরেন গোপনে হাত বাড়িয়ে তার পিঠে বিষম এক চিমটি কেটে দিলে।

শচীনবাবু বললেন, "আপনি কী বলছিলেন নারায়ণবাবু?"

নারায়ণের মুখে আর রা নেই। নরেন বললে, "নারায়ণের কথা নিয়ে আপনি মাথা ঘামাবেন না। ও হচ্ছে একটি আস্ত পাগল! আমি কিন্তু আর কষ্ট সইতে পারছি না। হয়ত এখনো চিকিৎসার সময় অতীত হয়ে যায়নি। আপনি যদি অনুগ্রহ করে এখনি একবার চন্দ্রবাবুকে পাঠিয়ে দেন, তাহলে আমি অতিশয় বাধিত হব।"

শচীনবাবু তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "আমার যাবার পথেই

চন্দ্রবাবুর বাড়ি পড়ে। আমি তাঁকে সব কথা জানিয়ে এখনি পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করছি। আপনার অবস্থা দেখে আমার ভয় হচ্ছে। আপনাকে হারালে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হব আমরাই।" বলেই তিনি দ্রুতপদে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

নারায়ণ ক্ষুব্ধ স্বরে বললে, "নরেন, তুমি হঠাৎ অত জোরে আমাকে চিমটি কাটলে কেন?"

নরেন রুক্ষ কণ্ঠে বললে, "কেন? সে-কথা পরে শুনো-অখন। তুমি খালি হস্তিমূর্খ নও, তুমি হচ্ছ গণ্ডমূর্খ!"

নারায়ণ কাঁচুমাচু মুখে বললে, "তুমি আমাকে এমন শক্ত শক্ত গালাগাল দিচ্ছ কেন নরেন? আমি কী মূর্খতা প্রকাশ করেছি?"

—"তুমি কিছু করনি। তুমি এখন দয়া করে নিজের ঘরে যাও। তারপরে যত খুশি খাবারের পাহাড় খণ্ড-খণ্ড করে কোঁৎ-কোঁৎ করে গিলে নিজের উদরকে দ্বিগুণ, ত্রিগুণ বা চতুর্গুণ করে তোল। আজ আর আমি তোমাকে কোন বাধা দেব না। আজ কেবল দয়া করে এইটুকু মনে রেখো, এখনি ডাক্তার চন্দ্রনাথ ঘোষ আমাকে দেখতে আসবেন। যতক্ষণ তিনি থাকবেন, এ ঘরে যেন তোমার টিকিটি দেখতে না পাই। আমার এ অনুরোধ রাখবে কি?"

নারায়ণ দস্তুরমত হতভম্বের মতন নরেনের দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর একটিমাত্র কথা উচ্চারণ না করে ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে গেল।

নরেন নিজের মনেই মুখ টিপে একটুখানি হেসে নিলে। তারপর একটা টেবিল টেনে নিজের খাটের পাশে এনে রাখলে। টেবিলের উপরে স্থাপন করলে একই রকমের ছোটখাট চার-পাঁচটা গেলাস —যে-রকম গেলাসে লোকে তরল ঔষধ পান করে। একটা ছোট কাঁচের ঢাকনি আগে নিজের বালিশের তলায় রেখে খাটের উপরে উঠে শয়ন করলে। তারপর দুই চক্ষু মুদ্রিত করে নিস্পন্দ হয়ে শুয়ে রইল।

মিনিট-পঁচিশ পরেই ডাক্তার চন্দ্রনাথ ঘোষ সেই ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়ালেন। সুদীর্ঘ বলিষ্ঠ মূর্তি, রং ফর্সা, পরনে কোট-পেন্টলুন। চক্ষুদুটি ছোট হলেও দৃষ্টিতে ফুটে উঠেছে তীক্ষ্ণ বুদ্ধির দীপ্তি। নাক দেখলে মনে পড়ে শুকচঞ্চু। ওষ্ঠাধরে মিষ্ট হাসির প্রলেপ যেন কখনো শুকোয় না।

সচমকে চক্ষু মেলে নরেন বললে, "কে? কে আপনি? আপনি কি চন্দ্রবাবু, শচীনবাবু এইমাত্র যাঁর কথা বলে গেলেন?"

বিনীতভাবে ঈষৎ অবনত হয়ে চন্দ্রবাবু বললেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ, আমারই নাম চন্দ্রনাথ ঘোষ। শচীনবাবুর মুখে শুনলাম, আপনি নাকি অত্যন্ত অসুস্থ?"

যন্ত্রণা-ভরা কণ্ঠে নরেন বললে, "হ্যাঁ ডাক্তারবাবু, বড়ই কষ্ট পাচ্ছি! আমার কী হয়েছে জানি না, কিন্তু আমার নিশ্বাস ক্রমেই যেন বন্ধ হয়ে আসছে।"

চন্দ্রবাবু কোন কথা না বলে একখানা চেয়ার টেনে এনে নরেনের শয্যার পাশে আসন গ্রহণ করলেন। তারপর গম্ভীরভাবে স্টেথস্-কোপটি বার করে নরেনের পৃষ্ঠ ও বক্ষদেশ পরীক্ষা করলেন। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে ওষ্ঠাধর মৃদু হাস্যে রঞ্জিত করে সুমিষ্ট স্বরে বললেন, "আপনার কোন ভয় নেই। যথাসময়েই আমাকে ডেকেছেন—যদিও আরো-কিছু আগে খবর পেলে আরো শীঘ্র আপনাকে নিরাময় করতে পারতুম। আপনার পীড়া গুরুতর হয়ে ওঠবার উপক্রম করছে বটে, তবু যাতে আপনি দু-তিন দিনের মধ্যেই আরোগ্য লাভ করেন, আমি সেই-রকম একটি ওষুধ দিয়ে যাচ্ছি।"

নরেন হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, "এই কষ্ট থেকে আমাকে মুক্তি দিন ডাক্তারবাবু, আমি চিরদিন আপনার গোলাম হয়ে থাকব!"

চন্দ্রনাথের অমন স্নিগ্ধ হাসিমাখা ওষ্ঠাধরের দুই প্রান্ত হঠাৎ কেমন কঠিন হয়ে উঠল—কিন্তু ক্ষণিকের জন্যে। তারপরেই তিনি রোগীর দেহের উপরে ঝুঁকে পড়ে প্রশান্ত স্বরে বললেন, "কোন

ভয় নেই নরেনবাবু। আপনার পীড়া এখনো গুরুতর হয়ে ওঠেনি।"

চন্দ্রবাবু উঠে দাঁড়ালেন। পাশের টেবিলের উপর থেকে একটি ঔষধ পান করবার ছোট কাঁচের গেলাস সামনের দিকে টেনে আনলেন। তারপর তিনি নিজের ব্যাগের ভিতর থেকে একটি বড় শিশি বার করে সেই গেলাসের ভিতরে ঢাললেন খানিকটা তরল পদার্থ। তারপর সেই ছোট ঔষধের গেলাসটি তুলে নিয়ে নরেনের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে কী যে করলেন, সেটা বোঝা গেল না।

মুখের উপর থেকে সমস্ত যন্ত্রণার চিহ্ন মুছে ফেলে নরেন অত্যন্ত সচেতন ও তীক্ষ্ণ চোখে চন্দ্রনাথের পিছন দিকে তাকিয়ে রইল। ডাক্তার যেই আবার সামনের দিকে ফিরলেন, অমনি মুখের ভাব বদলে ফেলে কাতর কণ্ঠে বললে, "ডাক্তারবাবু, বড় কষ্ট হচ্ছে!"

চন্দ্রবাবু ঔষধের গেলাসটি এগিয়ে দিয়ে বললেন, "এটা খেয়ে ফেলুন, সব কষ্ট জুড়িয়ে যাবে।"

নরেন থর-থর কম্পিত হস্তে ঔষধের পাত্রটি গ্রহণ করে ক্লান্ত কণ্ঠে বললে, "ডাক্তারবাবু, আপনাদের অ্যালোথ্যাথিক ওষুধ খেতে আমার বড় ভয় হয়। যদি আপনি কিছু মনে না করেন, একটি অনুরোধ করতে পারি কি?"

—"নিশ্চয়ই পারেন। বলুন, আপনি কী বলতে চান?"

—"ঘরের বাইরে ঐ বারান্দার ডান পাশেই র‍্যাকে আমার তোয়ালে টাঙানো আছে। অ্যালোপ্যাথিক ওষুধ কখনো খাইনি—কি জানি যদি বমন হয়। আপনি অনুগ্রহ করে তোয়ালেখানা একবার এনে দেবেন কি?"

—"একথা আবার বলতে! নিশ্চয়ই আমি এনে দেব!" বলেই চন্দ্রবাবু বাইরে গেলেন।

সেই মুহূর্তে নরেনের সমস্ত জড়তা এবং অসহায়তার ভাব অদৃশ্য হয়ে গেল। চন্দ্রবাবুর দেওয়া ঔষধের পাত্রটি বিদ্যুৎবেগে সে হেঁট

হয়ে খাটের তলায় রেখে দিলে এবং সঙ্গে সঙ্গে বালিসের তলা থেকে ঢাকনিটি বার করে তার উপরে দিলে চাপা। তারপর খাটের পাশের টেবিলের উপর থেকে ঠিক সেই-রকম দেখতে আর একটি ঔষধ পান করবার শূন্য গেলাস তুলে নিয়ে আবার বিছানার উপরে শুয়ে পড়ল এবং সঙ্গে সঙ্গে তার মুখের উপরে ফুটে উঠল দারুণ যন্ত্রণার চিহ্ন।

চন্দ্রবাবু তোয়ালে হাতে করে ঘরের ভিতর ঢুকে নরেনের হাতের দিকে তাকিয়ে বললেন, "এই যে, ওষুধটা খেয়ে ফেলেছেন দেখছি! বেশ, বেশ!" তাঁর মুখের উপরে ফুটে উঠল পরিতৃপ্তির ভাব।

নরেন ঢোক গিলতে গিলতে বললে, "খেয়েছি ডাক্তারবাবু! বড় গা-বমি-বমি করছে!"

চন্দ্রবাবু বললেন, "কোন ভয় নেই, ওটা এখনি সেরে যাবে।" তারপর আর মিনিট-পাঁচেক কথাবার্তা কয়ে, "কাল সকালে আবার আসব" বলে তিনি সেদিনকার মতন বিদায় নিলেন।

নরেন আর কিছুক্ষণ চুপ করে শুয়ে রইল, তারপর হঠাৎ শয্যা ত্যাগ করে দাঁড়িয়ে উঠে চেঁচিয়ে ডাকল, "ওহে নারায়ণ, ওহে বন্ধুবর, একবার দয়া করে এদিকে আসবে কি?"

নারায়ণ ঘরের ভিতরে এসে বিস্মিত চোখে দেখলে, নরেনের মুখের উপরে রোগের আর কোন চিহ্নই নেই। জিজ্ঞাসা করলে, "আজ তোমার ব্যাপারখানা কী বল দেখি? দেখে তো মনে হচ্ছে না তোমার কোন অসুখ হয়েছে!"

নরেন কৌতুক-হাস্যে উচ্ছ্বসিত হয়ে বললে, "অসুখ? অসুখ আবার কিসের? অসুখ হোক শত্রুর!"

নারায়ণ মূঢ়ের মতন বললে, "তাহলে সত্যিই তোমার কোন অসুখ হয়নি?"

—"উঁহু!"

—"তবে ডাক্তার ডেকেছিলে কেন?"

—"কিঞ্চিৎ ঔষধ সেবন করব বলে।"

—"অসুখ হয়নি, অথচ ওষুধ খাবে?"

—"খাব কেন? আমি দেখতে চেয়েছিলুম, ডাক্তারবাবু আমাকে কী ওষুধ দেন।"

নারায়ণ মুখভঙ্গী করে বললে, "তোমার কথার মানে আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। এতক্ষণ ধরে রোগের অভিনয় করলে, ডাক্তারবাবু কী ওষুধ দেন কেবল তাই দেখবার জন্যে?"

—"ঠিক তাই।"

—"ওষুধ পেয়েছ?"

—"হ্যাঁ, ঐ দেখ।" নরেন খাটের তলার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করলে।

নারায়ণ হেঁট হয়ে ঔষধের গ্লাসটা নেবার জন্যে হাত বাড়ালে, সঙ্গে সঙ্গে নরেন সবলে তার হাতখানা চেপে ধরে বললে, "আরে আরে, কর কি!"

—"হঠাৎ অমন করে উঠলে কেন?"

—"খবরদার ও ওষুধের গেলাস ছুঁয়ো না!"

নারায়ণ অধিকতর বিস্মিত হয়ে বললে, "কেন বল দেখি?"

—"ওর ভেতরে ভীষণ বিষ আছে!"

—"বিষ?"

—"সেই রকমই তো আন্দাজ করছি। ঐ ওষুধটা জীবাণু-তত্ত্ববিদের কাছে পরীক্ষার জন্যে পাঠিয়ে দিতে চাই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ওর মধ্যে আছে নিউমোনিয়ার জীবাণু। নারায়ণ, ঐ চন্দ্রবাবুটি আজ এখানে এসেছিলেন আমার দেহের ভিতরে নিউমোনিয়া রোগের বীজ বপন করতে।"

নারায়ণ খানিকক্ষণ স্তম্ভিতের মতন আড়ষ্ট হয়ে বসে রইল। তারপর ধীরে ধীরে বললে, "তাহলে ঐ ডাক্তারটি হচ্ছে হত্যাকারী?"

—"হ্যাঁ, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এই অদ্ভুত উপায়ে

চন্দ্রবাবু আমার আগেই আরো তিনজন হতভাগ্যকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিয়েছেন। তিনি করেছেন হত্যা, অথচ আইন বলবে ওদের মৃত্যু হয়েছে স্বাভাবিক কারণে। আমিও গোড়া থেকেই এই সন্দেহই করে আসছি। কাঁচের চুড়িটা পেয়ে সন্দেহ আমার দৃঢ়তর হয়ে ওঠে। আমি জানি জার্মান গুপ্তচররা এইভাবে অনেক শত্রু নিপাত করেছে।"

নারায়ণ বললে, "হুঁ! এখন বোঝা যাচ্ছে, ডাক্তার চন্দ্রনাথ ঘোষ পরিচালিত হচ্ছেন পঞ্চম-বাহিনীর দ্বারাই!"

—"সে-বিষয়েও সন্দেহ নেই।"

—"ঐ ভয়ানক লোকটাকে তো এখুনি গ্রেপ্তার করা উচিত!"

—"না, এখনো গ্রেপ্তারের সময় হয়নি। এখন ওকে গ্রেপ্তার করলে দলের আর সবাই সাবধান হয়ে যাবে। খালি ওকে নয়, আমি গ্রেপ্তার করতে চাই সমস্ত দলটাকে। জালে শিকার পড়েছে, আর পালাতে পারবে না। আপাতত আমাদের প্রধান কর্তব্য হচ্ছে, চার নম্বরের বাড়িখানাকে আবিষ্কার করা। এই নাটকের শেষ দৃশ্যের অভিনয় হবে সেই বাড়ির ভিতরেই।"

৫
জাগো নারায়ণ

দুদিন পরে ফোনে শচীনবাবুর গলা পাওয়া গেল—"কেমন আছেন নরেনবাবু? আপনার জন্যে আমার মন বড় উদ্বিগ্ন হয়ে আছে।"

নরেন বললে, "কেন?"

—"শুনলাম আপনার দেহে নাকি নিউমোনিয়ার লক্ষণ দেখা দিয়েছে?"

—"কে বললে?"

—"চন্দ্রনাথ।"

নরেন হেসে বললে, "কালও ডাক্তারবাবু এসেছিলেন। তাহলে তাঁরও বিশ্বাস যে আমি নিউমোনিয়ার দ্বারা আক্রান্ত হয়েছি ?"

—"তাঁর তো তাই মত।"

—"জানি না আমার নিউমোনিয়া হয়েছে কি না। তবে আমার বুকের ভিতরটা বিষম টাটিয়ে উঠেছে, আর একটু-একটু জ্বর হচ্ছে বটে। হয়ত গোয়েন্দাদের ভিতরে আমিই হব চতুর্থ বলি।"

—"বড়ই আশ্চর্য কথা মশাই, এমন যোগাযোগ যে হতে পারে আমার ধারণাই ছিল না।"

—"শচীনবাবু, আমি কী স্থির করেছি জানেন ?"

—"কী ?"

—"আমি আর চন্দ্রনাথবাবুর চিকিৎসায় থাকব না। নতুন কোন ডাক্তারকে ডাকব।"

একটু চুপ করে থেকে শচীনবাবু বললেন, "আমারও মনে হচ্ছে আপনার তাই করাই উচিত। এবারে আমারও বিষম সন্দেহ হচ্ছে।"

—"কী সন্দেহ ?"

—"বেছে বেছে পুলিশের লোকের উপরে নিউমোনিয়ার এই আক্রমণ, এর মধ্যে কোন রহস্য আছে কি না।"

—"সেটা পরে বোঝা যাবে। শচীনবাবু, আপাতত আপনাকে আমার একটি কথা রাখতে হবে। চন্দ্রবাবুকে দয়া করে জানিয়ে দেবেন যে আমি এখন শয্যাগত, আর নতুন ডাক্তার আমার চিকিৎসা করছেন। তাঁকে আর কষ্ট করে আমার এখানে আসতে হবে না।"

—"জানিয়ে দেব। অবশ্য চন্দ্রনাথ মনে মনে বোধহয় ক্ষুণ্ণ হবে। তা আর কী করা যাবে ? সকলের সব ডাক্তারের উপর বিশ্বাস থাকে না।"

নরেন বললে, "না শচীনবাবু, তাই নয়। চন্দ্রবাবুর উপরে আমি আমার বিশ্বাস হারিয়ে ফেলিনি।"

—"তবে ?"

—"আমার বিশ্বাস নিউমোনিয়া রোগ সম্বন্ধে চন্দ্রবাবু অনেক নূতন তথ্যই জানেন। এদেশের অনেক ডাক্তারের চেয়ে এ-বিভাগে তাঁর জ্ঞান বোধহয় খুব গভীর।"

শচীনবাবু বিস্মিত কণ্ঠে বললেন, "তবু আপনি তাঁর চিকিৎসায় থাকতে চান না কেন ?"

মুখ টিপে হাসতে হাসতে নরেন বললে, "কিন্তু অতি-বুদ্ধির মতন অতি-জ্ঞানও যে সময়ে সময়ে মারাত্মক হতে পারে, চন্দ্রবাবু হচ্ছেন তারই একটি মূর্তিমান প্রমাণ।"

শচীনবাবু হতভম্বের মত বললেন, "আপনি কী বলতে চান নরেনবাবু ?"

—"আমি খালি বলতে চাই, চন্দ্রবাবুর অতি-জ্ঞানের মহিমায় উপর-উপরি চারজন পুলিশ-কর্মচারী একই নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোকের টিকিট কাটতে বাধ্য হয়েছে। চন্দ্রবাবু যারই চিকিৎসার ভার নেন, তাকেই ধরে নিউমোনিয়ায়। আপনিই বলুন, কোন্ ভরসায় এমন ডাক্তারের হাতে আত্মসমর্পণ করি ?"

শচীনবাবু উত্তেজিত স্বরে বললেন, "নরেনবাবু, নরেনবাবু, আপনি কি বলতে চান যে—না, না, অসম্ভব !"

তাড়াতাড়ি ও-প্রসঙ্গ ছেড়ে দিয়ে নরেন জিজ্ঞাসা করলে, "চার নম্বরের বাড়ির ঠিকানাটা আদায় করতে পেরেছেন ?"

—"কেমন করে পারব ?"

—"খুব সহজেই। নৃপেশের উপরে কড়া পাহারা রাখুন। আসছে অমাবস্যার রাত্রে নিশ্চয়ই সে চার নম্বর বাড়িতে গিয়ে হাজির হবে।"

—"এ যে আপনি বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধতে বলছেন ! আমি নৃপেশের নামই খালি শুনেছি, তার চেহারাও কখনো দেখিনি আর সে কোথায় থাকে তাও জানি না।"

—"নৃপেশের ঠিকানা আমি আপনাকে বাতলে দেব।"

—"কী আশ্চর্য, আপনি তার ঠিকানা জানেন ?"

—"জানি বৈকি ! আমার লোকেরাও তার উপরে নজর রেখেছে যে ! আপনি আরো ভালরকম পাহারার ব্যবস্থা করুন। দেখবেন, আপনাদের ফাঁকি দিয়ে সে যেন লুকিয়ে চার নম্বরের বাড়িতে গিয়ে হাজির হতে না পারে।"

শচীনবাবু মহা উৎসাহে বলে উঠলেন, "বেশ, বেশ ! এই এক চালেই বোধহয় কিস্তিমাৎ করতে পারব। আপনি বাহাত্নর ব্যক্তি দেখছি ! কিন্তু খুব সাবধানে থাকবেন নরেনবাবু, আপনাকে আমরা হারাতে পারব না ! আজ তাহলে আসি, নমস্কার।"

* * * *

একে একে কয়েকটা দিন কেটে গিয়ে এল কালো অমাবস্যার রাত্রি। টেলিফোন-যন্ত্রের সামনে বসে নরেন ও নারায়ণ কথাবার্তা কইছে, এমন সময় বেজে উঠল ফোনের ঘণ্টা।

রিসিভারটা তুলে নিয়ে নরেন স্থধোলে, "হ্যালো, কে আপনি ?"

উত্তেজিত কণ্ঠস্বরে শোনা গেল, "আমি শচীন। আপনার কথাই ঠিক ! আজ রাত নয়টার সময় নৃপেশ একখানা ট্যাক্সিতে চড়ে ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের উপরে একখানা মস্ত-বড় কিন্তু সেকেলে বাগান-বাড়ির ভিতরে গিয়ে ঢুকেছে। নিশ্চয়ই ঐখানা হচ্ছে তাদের চার নম্বরের বাড়ি। আমরা একটু পরেই বাড়িখানা ঘেরাও করতে যাচ্ছি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আপনি তো আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারবেন না !"

—"নিশ্চয়ই পারব।"

—"বলেন কী মশাই ! ঐ অস্থস্থ শরীরে ?"

—"আমার শরীর সম্পূর্ণ স্থস্থ। নিউমোনিয়া চুলোয় যাক, আমার কোন অস্থখই হয়নি।"

ফোন খানিকক্ষণ মৌন। বোধহয় শচীনবাবু এত বেশি বিস্মিত হয়েছিলেন, যে তাঁর আর কথা বলবার শক্তি ছিল না। তারপর

রিসিভার পুনর্বার বহন করে নিয়ে এল শচীনবাবুর কণ্ঠস্বর—"আপনার নিউমোনিয়া হয় নি !"

—"উঁহু !"

—"কিন্তু চন্দ্রনাথও যে বললে, আপনার নিউমোনিয়া হয়েছে !"

—"চন্দ্রবাবু বোধহয় মনে করেন নিউমোনিয়া রোগটি তাঁর অনুগত ভৃত্য।"

—"মানে ?"

—"ক্রমশ প্রকাশ পাবে।"

—"তাহলে আপনি শয্যাগত হয়ে আছেন কেন ?"

—"ওটা মিথ্যা রটনা। আমি শত্রুদের ভোলাতে চেয়েছি।"

—"আঃ, শুনে নিশ্চিন্ত হলুম ! তাহলে আপনি আসছেন ?"

—"আমরা প্রস্তুত। আমি আর নারায়ণ। আমরা দলে বেশ ভারি হয়ে যাব তো ?"

—"সে কথা আর বলতে ! চার নম্বরের বাড়ি থেকে আজ একটা ইঁদুরও বাইরে বেরুবার পথ পাবে না। আজই আমরা বুঝতে পারব, বড়বাবু আর ছোটবাবু এ দুই মহাত্মার আসল পরিচয় কী। তাহলে এখনি চলে আসুন। একটু আগে থাকতেই ঘটনাস্থলে পৌঁছনো দরকার। নমস্কার।"

রিসিভারটা রেখে দিয়ে নরেন বললে, "জাগো নারায়ণ, যুদ্ধযাত্রার আয়োজন কর।"

নারায়ণ সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে মিলিটারি কায়দায় একটা সেলাম ঠুকে বললে, "যথা আজ্ঞা, সেনাপতি !"

—"হ্যাঁ নারায়ণ, এইবারে রঙ্গমঞ্চের উপরে তুমিই হবে প্রধান অভিনেতা।"

—"কেন ?"

—"কারণ আমার মস্তিষ্কের কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। এইবার হয়ত দরকার হবে তোমার বাহুবল।"

—"বাহু আমার বহুক্ষণ থেকেই তোমার আদেশের অপেক্ষায় আছে।"

—"আদেশ পেলে। হে বীরবাহু, এখন অগ্রসর হও।"

৬

অমাবস্যায়

অমাবস্যার রাত।

ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড অদৃশ্য হয়ে গেছে নিবিড় অন্ধকারের ঘেরাটোপের মধ্যে।

অন্ধকারের সঙ্গে পাপের বন্ধুত্ব অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। সাধুরা তাকে ভয় করে, কিন্তু পাপীরা খোঁজে অন্ধকারের আশ্রয়।

সেই ঝিল্লিমন্দ্রিত, জোনাকিখচিত অন্ধকারের ভিতরে মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে এক-একখানা গাড়ির শব্দ। কোন গাড়ির শব্দ কাছে এসেই আবার দ্রুতবেগে চলে যাচ্ছে, আবার কোন-কোন গাড়ির শব্দ যাচ্ছে হঠাৎ বন্ধ হয়ে। এখন চোখ দিয়ে কিছুই দেখা যায় না, ধ্বনি শুনে কান দিয়ে সব অনুমান করে নিতে হয়।

রাত বারোটা বাজল। এইবারে আমাদের প্রবেশ করতে হবে একখানা বাগানবাড়ির মধ্যে। বাহির থেকে তার মধ্যে কোন জীবনের লক্ষণ পাওয়া যাচ্ছে না বটে, কিন্তু ভিতরে ঢুকলেই আমরা দেখতে পাব, মস্ত একখানা হলঘরের মধ্যে স্থির হয়ে বসে আছে একদল লোক।

একদিকে রয়েছে অনেকগুলো চেয়ার সাজানো এবং আর এক-দিকে প্ল্যাটফর্মের উপরে আছে একটি টেবিল ও দুইখানা চেয়ার। প্ল্যাটফর্মের উপরে ও নিচে কোন চেয়ারই খালি নেই। এ যেন একটা সভার দৃশ্য—কিন্তু কোন সভ্যেরই মুখ দেখবার জো নেই। প্রত্যেকেরই মুখের উপরে বিরাজ করছে একটা করে কালো কাপড়ের মুখোস বা মাস্ক। ঘরের ছাদের মাঝখান থেকে ঝুলছে একটি

কেরোসিনের ল্যাম্প, তার আলো এমন অপ্রচুর, যে চারিদিকেই দেখা যায় আবছায়ার লীলা।

প্ল্যাটফর্মের উপরে যে দু-জন লোক বসে ছিল, তাদের একজন ফিস-ফিস করে আর-একজনকে সম্বোধন করে বললে, "ছোটবাবু, আজ আমাদের এখানে ক-জন সভ্য আসবার কথা ছিল মনে আছে?"

—"মনে আছে বড়বাবু। তিরিশ জন।"

—"একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছ কি?"

—"কী ব্যাপার?"

—"আমরা ক-জন এখানে আছি একবার গুনে দেখ দেখি?"

ছোটবাবু মনে মনে গণনা করে সবিস্ময়ে বললে, "এখানে সভ্য তো দেখছি বত্রিশ জন!"

—"তাহলে এই বাড়তি সভ্য দু-জন কেমন করে এখানে এল?"

ছোটবাবু মাথা চুলকোতে চুলকোতে বললে, "কিছুই তো বুঝতে পারছি না!"

—"কিন্তু আমাদের বুঝতে হবেই। মাঝখানের দরজার কাছে ঐ যে দুটি লোক বসে আছে, ওদের দেখে কী বুঝছ?"

—"দেখছি তো একজন ভয়ানক লম্বা-চওড়া, আর একজন হচ্ছে ভয়ানক বেঁটে আর রোগা।"

—"ওদের দেখে আমার কাদের মনে পড়ছে জান? নর-নারায়ণকে।"

—"কিন্তু তা—তা কেমন করে হবে বড়বাবু? আমরা তো সকলেই জানি, নরেন এখন নিউমোনিয়া রোগে একেবারে শয্যাগত হয়ে পড়েছে। আর তার বিছানার পাশে দিনরাত বসে আছে তার বন্ধু নারায়ণ।"

—"ধরলুম নর-নারায়ণের পক্ষে এখানে আসা অসম্ভব। তবে ওরা কে? ব্যাপারটা ভাল বোধ হচ্ছে না! ওদের পাশের ঘরে নিয়ে চল। আগে ওদের পরীক্ষা না করে কোন কাজই করা চলবে না।"

ছোটবাবু ইঙ্গিত করে ডাকতেই দু-জন বলিষ্ঠ চেহারার লোক তার

কাছে এসে দাঁড়াল। সে তাদের কানে কানে কি কথা বললে কিছুই শোনা গেল না। লোকদুটো পায়ে পায়ে এগিয়ে প্রথমেই সেই বৃহৎ মূর্তিটির দুই পাশে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর দু-দিক থেকে তার দুই হাত চেপে ধরে বললে, "তোমাকে একবার পাশের ঘরে যেতে হবে।"

অকস্মাৎ মূর্তিটা একলাফে দাঁড়িয়ে উঠল, তারপর ঝট্‌কান মেরে মুক্ত করে নিল নিজের হাত দুখানা। পরমুহূর্তে যারা তার হাত ধরেছিল, তারা দু-জনেই দূরে গিয়ে ঠিকরে পড়ল।

ইতিমধ্যেই ছোটখাটো লোকটিও দাঁড়িয়ে উঠে বাঁ-হাত দিয়ে জামার পকেট থেকে একটা বাঁশি বার করে খুব জোরে ফুঁ দিলে এবং ডান হাত দিয়ে আর-এক পকেট থেকে বার করলে রিভলভার। বড় মূর্তিটিও আর-একটি রিভলভার বার করতে দেরি করলে না।

সভার সকলেই বিপুল বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে উঠে প্রথমটা হতভম্বের মত হয়ে রইল।

তারপরেই বাহির থেকে জাগল কার উচ্চ সতর্কবাণী—"পালাও, পালাও! পুলিশ!" সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল অনেকগুলো জুতো-পরা পায়ের দৌড়োদৌড়ির শব্দ।

তারপরই বেধে গেল মহা গোলমাল। সকলেই সভয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে নানা দিক দিয়ে পালাবার চেষ্টা করলে।

বড়বাবু ও ছোটবাবুও প্ল্যাটফর্মের উপর থেকে লাফিয়ে পড়ল, কিন্তু কোথা থেকে স্বয়ং শচীনবাবু এসেই বজ্রমুষ্টিতে চেপে ধরলেন ছোটবাবুর কণ্ঠদেশ। বড়বাবু বিদ্যুৎ-বেগে অদৃশ্য হল একটা দরজার ভিতর দিয়ে। নরেন ও নারায়ণ তখন টান মেরে নিজেদের মুখোস খুলে ফেলেছে। তারা ছুটল বড়বাবুর পিছনে পিছনে।

নরেন ও নারায়ণ বাইরের বারান্দায় এসে পড়েই দেখলে, বড়বাবু দৌড়ে একটা ঘরের ভিতরে ঢুকে সশব্দে বন্ধ করে দিলে দরজা। নারায়ণ ছুটে গিয়ে দরজার উপরে পদাঘাতের পর পদাঘাত করতে লাগল। সে প্রচণ্ড আঘাত দরজার পাল্লা বেশিক্ষণ সহ্য করতে পারলে

না, খিল ভেঙে দড়াম্ করে খুলে গেল। নরেন ও নারায়ণ অন্ধকার ঘরের ভিতরে ঢুকে নিজেদের টর্চ জ্বেলে ফেললে, কিন্তু ঘরের কোন-দিকে কেউ নেই।

এক কোণে ছিল ছোট একটা তক্তাপোশ। তাছাড়া ঘরের ভিতরে আর কোন আসবাবই নেই। নারায়ণ ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বললে, "কি আশ্চর্য, লোকটা গেল কোথায়? ফুস-মন্ত্রে উড়ে গেল নাকি?"

নরেন বললে, "মানুষের দেহ কর্পূর দিয়ে গড়া নয়, আর কর্পূরও এত তাড়াতাড়ি উপে যেতে পারে না।"

—"তবে সে গেল কোথায়? আমরা যে স্বচক্ষে তাকে এই ঘরে ঢুকতে দেখেছি। এ-ঘর থেকে তো বেরুবার আর কোন পথ নেই?"

নরেন বললে, "ঐ তক্তাপোশখানা টেনে সরিয়ে আন দেখি!"

নারায়ণ তক্তাপোশখানা হিড়-হিড় করে একদিকে টেনে আনলে। তারপরেই দেখা গেল তক্তাপোশের ঠিক তলায় মেঝের উপরে রয়েছে ছোট একটা কাঠের দরজা।

নরেন বললে, "বড়বাবু তক্তাপোশ সরিয়ে এই দরজা খুলে পাতাল-প্রবেশ করেছেন। ভিতরে নেমে দরজা বন্ধ করবার আগে তক্তাপোশখানা আবার যথাস্থানে টেনে এনে রেখেছেন। এইবারে আমাদেরও পাতাল-প্রবেশের ব্যবস্থা করতে হবে।"

ততক্ষণে শচীনবাবুও কয়েকজন পাহারাওয়ালার সঙ্গে ছুটে এসে বললেন, "এখানে আবার কী ব্যাপার?"

নারায়ণ বললে, "দলের সর্দার এই দরজার আড়ালে বসে বিশ্রাম করছে। দরজাটা ভেঙে ফেলবার ব্যবস্থা করুন।"

পাহারাওয়ালারা খানিকক্ষণ চেষ্টা করবার পরই দরজার পাল্লা দুইখানা খুলে নিচের দিকে ঝুলে পড়ল। নিচের দিকে উঁকি মেরে দেখা গেল কয়েকটা ছোট-ছোট সিঁড়ির ধাপ। তারপর অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না।

হঠাৎ সুড়ঙ্গের ভিতরে জাগল রিভলভারের গর্জন এবং সেইসঙ্গে

শোনা গেল একটা ভারি জিনিসের পতন-শব্দ। তারপর আবার সব চুপচাপ।

শচীনবাবু বললেন,"এখন কী করা উচিত? লোকটা দেখছি সশস্ত্র!"

নরেন মাথা নাড়তে নাড়তে সহাস্যে বললে, "আমার বিশ্বাস, সুড়ঙ্গের ভিতর ঢুকলে এখন দেখতে পাওয়া যাবে বড়বাবুর মৃতদেহ। সে বোধহয় আত্মহত্যা করেছে।"

নরেনের অনুমানই সত্য হল। পাহারাওয়ালারা সুড়ঙ্গের ভিতর থেকে বার করে নিয়ে এল একটা রক্তাক্ত দেহ।

কিন্তু সে তখনো মারা পড়েনি। নারায়ণ টান মারতেই তার মুখের আবরণ গেল সরে।

শচীনবাবু বিপুল বিস্ময়ে বলে উঠলেন, "একি! এ যে ডাক্তার চন্দ্রনাথ ঘোষ!"

নরেন হাস্যমুখে বললে, "চন্দ্রনাথকে চিনতে পেরেছেন দেখে খুশি হলুম। হ্যাঁ শচীনবাবু, এই চন্দ্রনাথ প্রকাশ্যে সাজে পুলিশের প্রিয় ডাক্তার, আর যবনিকার অন্তরালে বসে চালনা করে গুপ্তচরের এই বৃহৎ দলটি।"

শচীনবাবু তখনও বিস্ময়ের ধাক্কা সামলাতে পারেন নি। হতভম্ব-ভাবে বললেন, "চন্দ্রনাথ পঞ্চম-বাহিনীর সর্দার!"

—"এ-বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই।"

—"অথচ এই চন্দ্রনাথ মুখের কথায় আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছিল, পৃথিবীতে তার চেয়ে বড় শত্রু জাপানিদের আর কেউ নেই।"

—"আপনার মত পাকা পুলিশের চোখে যখন ধুলো দিয়েছে, তখন চন্দ্রনাথকে একজন প্রথম শ্রেণীর অভিনেতা বলে স্বীকার করতেই হবে।"

নারায়ণ বললে, "কিন্তু চন্দ্রনাথ কেমন করে জাপানিদের গুপ্তচর হল?"

নরেন বললে, "আমার বিশ্বাস চন্দ্রনাথ যখন বর্মায় ছিল তখনি সে এই সুযোগ পেয়েছিল। তারপর সাধারণ পলাতকের মতই

আবার ভারতবর্ষের ভিতরে প্রবেশ করেছে আর শত্রুদের টাকায় গড়ে তুলেছে এই মস্ত গুপ্তচর-সমিতি।"

নরেনের একখানা হাত চেপে ধরে শচীনবাবু বললেন, "নরেনবাবু, আপনাকে বহু ধন্যবাদ! আপনি না থাকলে চন্দ্রনাথ আজ ধরা পড়ত না।"

চন্দ্রনাথ আস্তে আস্তে দুই চোখ মেলে একবার সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলে। অতি মৃদু হাসি হেসে অস্পষ্ট স্বরে বললে, "কিন্তু তোমরা আমাকে ধরে রাখতে পারবে না। আমি এখনি তোমাদের ফাঁকি দেব।"

সে ফাঁকিই দিলে। মিনিট-দশেকের মধ্যেই তার মৃত্যু হল।

কিন্তু তার দলের সকলেই ধরা পড়ল।

পরে জানা গেল, চন্দ্রনাথের সঙ্গে আরো কয়েকজন বিপথগামী ভারতবাসীকে নিয়ে একখানা জাপানি সাবমেরিন ব্রহ্মদেশ থেকে সমুদ্রপথে সুন্দরবন অঞ্চলে নামিয়ে দিয়ে গিয়েছিল।

তাদের বিভিন্ন আড্ডা খানাতল্লাস করে পাওয়া গেল কাঁচের চুঙির ভিতরে সুরক্ষিত বিভিন্ন মারাত্মক ব্যাধির জীবাণু, ভারতবর্ষের নানা দেশের বড় বড় মানচিত্র, অনেকরকম আগ্নেয়াস্ত্র আর বোমা ও ডিনামাইট এবং শত্রুপক্ষের কাছে খবর পাঠাবার জন্যে বেতার যন্ত্র প্রভৃতি আরো অনেক জিনিস।

নরেন বললে, "দেখ নারায়ণ, অপরাধীরা অতি-চালাক হলেও প্রায়ই ধরা পড়ে অতি-বোকামির জন্যে। চন্দ্রনাথের কাছে আরো কত রকম জীবাণু ছিল। কিন্তু সে যদি বারবার একই রোগের জীবাণু ব্যবহার না করত, তাহলে আমাদের সন্দেহ এত শীঘ্র তার উপরে গিয়ে পড়ত না।"

নারায়ণ সভয়ে মুখভঙ্গি করে বললে, "বাপু! এ অস্ত্রযুদ্ধ নয়, মল্লযুদ্ধ নয়, এ হচ্ছে জীবাণু যুদ্ধ! এসব বোঝবার মতন বুদ্ধি বা বিদ্যে আমার নেই।"

বাড়ি, বুড়ো, বুট

বাড়িখানি ভারি ভাল লাগল। চারিধারে বাগান—যদিও ফুলগাছের চেয়ে বড় বড় গাছই বেশি। টেনিস-খেলার জমি, মাঝে মাঝে শ্বেতপাথরের বেদী, একটি ছোট বাহারি ফোয়ারা, এখানে-ওখানে লাল কাঁকর-বিছানো পথ।

দোতালা বাড়ি—একেবারে হাল ফ্যাসানের না হলেও সেকেলে নয়। বাড়ির জানলায় বা দেয়ালে প্রাচীনতার কোন চিহ্নই নেই। কোথাও ফাট ধরেনি, কোথাও অশথ-বট এসে জোর করে জুড়ে বসেনি।

কিন্তু তবু মনে হল বাড়িখানা যেন রহস্যময়। ভাবলুম বাড়ির মাথা ছাড়িয়ে উঠে মস্ত মস্ত গাছগুলো নিজেদের জন্যে একটি ছায়ার জগৎ সৃষ্টি করেছে বলেই হয়ত এখানে এমন রহস্যের আবহ গড়ে উঠেছে। আমার পক্ষে এও এক আকর্ষণ। আমি রহস্য ভালবাসি। রহস্যের মধ্যে থাকে রোমান্সের গন্ধ।

সাঁওতাল পরগনার একটি জায়গা। স্ত্রী এবং ছেলেমেয়েদের বায়ু-পরিবর্তনের দরকার—ডাক্তারের মতে এ-জায়গাটি নাকি অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর। বন্ধু প্রকাশের সঙ্গে এখানে এসেছি, মনের মতন একটি বাড়ি খুঁজে নিতে। আজকের ট্রেনেই কলকাতায় ফিরব।

খানিক ডাকাডাকির পর বাগানের ভিতর থেকে একটি লোক বেরিয়ে এল—তার চেহারা না মালী, না দ্বারবান, না ভদ্র না ইতর লোকের মত। তার বয়স আশিও হতে পারে, একশোও হতে পারে। তার মাথায় ধবধবে সাদা, এলোমেলো লম্বা লম্বা চুল। তার কোমর এমন ভাঙা যে, হাড়-জিরজিরে দেহের উপর-অংশ একেবারে তুমড়ে পড়েছে। কিন্তু হাতের লাঠি ঠক্‌ঠকিয়ে সে এত

তাড়াতাড়ি এগিয়ে এল যে, তার অসম্ভব ক্ষিপ্রতা দেখে বিস্মিত হলুম। সে জিজ্ঞাসা করলে, "আপনারা কী চান?"

—"বাড়ির ফটকের উপরে লেখা রয়েছে—টু লেট। আমরা এই বাড়িখানা ভাড়া নিতে চাই।"

লোকটা হঠাৎ মুখ তুলে তাকালো। সে এতক্ষণ মাথা হেঁট করে ছিল বলে তার চোখ দেখতে পাইনি। এখনো দেখতে পেলুম না, কারণ তার চোখদুটো এমনি অস্বাভাবিকভাবে কোটরগত যে, প্রথম দৃষ্টিতে তাদের আবিষ্কার করাই যায় না। মনে হয়, লোকটা বুঝি অন্ধ। কিন্তু তারপর লক্ষ্য করে দেখলুম, দুই কোটরের ভিতর দিকে কি যেন চক্-চক্ করছে—দুই অন্ধকার গর্তের মধ্যে যেন দুই দীপ-শিখার ইঙ্গিত।

লোকটা আবার মুখ নামিয়ে ফেলে থেমে থেমে বললে, "ভাড়া নিতে চান? এই বাড়ি ভাড়া নিতে চান? বেশ!"

—"বাড়িখানা আমাদের পছন্দ হয়েছে। এ বাড়ির মালিক কে?"

—"বাড়ির এখনকার মালিক থাকেন বিলাতে। আগেকার মালিক কোথায় থাকেন, কেউ জানে না।"

—"তাহলে ভাড়া দেব কাকে?"

—"আমাকে।"

—"কত ভাড়া?"

—"সেটা ঠিক করবেন আপনারাই।"

রহস্যময় বাড়ি, রহস্যময় বৃদ্ধ এবং তার কথাগুলোও কম রহস্যময় নয়। মনে হল, রহস্যের মাত্রা যেন ছাড়িয়ে যাচ্ছে। এতটা ভাল নয়।

কী বলব ভাবছি, হঠাৎ গায়ে পড়ল একফোঁটা জল। চমকে মুখ তুলে দেখি, ইতিমধ্যে আমাদের অজান্তেই আকাশে হয়েছে মেঘের সঞ্চার।

বুড়ো বললে, "বৃষ্টি আসছে। আপনারা একটু ভিতরে গিয়ে দাঁড়াবেন চলুন।"

বুড়োর পিছনে পিছনে বাড়ির নিচের তালার বারান্দার তলায় গিয়ে দাঁড়ালুম।

ঝম্-ঝম্ করে বৃষ্টি নামল।

প্রকাশ আমার দিকে ফিরে বললে, "বৃষ্টিতে এখানে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই। চল, আগে বাড়ির উপরকার ঘরগুলো একবার দেখে আসি।"

বুড়োর দিকে ফিরে দেখি, সে উর্ধ্বমুখে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। আমি তাকে ডাকলুম, সে যেন শুনতেই পেল না। খানিক পরে হঠাৎ বললে, "ঘড়িতে কটা বেজেছে?"

হাত-ঘড়ির দিকে দৃষ্টিপাত করে বললুম, "এখন সাড়ে পাঁচটা।"

বুড়ো যেন শীতার্ত কণ্ঠে কাঁপতে কাঁপতে বললে, "আকাশে মেঘ আরো জমে উঠছে। অন্ধকারে সন্ধ্যা নামবে তাড়াতাড়ি! এ বৃষ্টি সন্ধ্যার পরেও পড়বে!"

—"না পড়তেও পারে।"

—"না, না, এ বৃষ্টি এখন থামবে না, হয়ত আজ সারা রাত ধরেই পড়বে। আমি মেঘ দেখেই বুঝতে পারি।"

প্রকাশ বললে, "কী সর্বনাশ, তাহলে আমরা স্টেশনে যাব কী করে? আজই যে আমাদের কলকাতায় ফেরবার কথা।"

বুড়ো ঘাড় নাড়তে নাড়তে বললে, "এ বৃষ্টি আজ আর থামবে না—আজ আর থামবে না! পাহাড়ে নদী ফুলে উঠবে, মাঠ ভেসে যাবে, পথ ডুবে যাবে। পালাতে চান তো এখনি পালান! সন্ধ্যার পর রাত আসবে, ঝড় উঠবে, বন কাঁদবে—এ বৃষ্টি আজ আর থামবে না। এখনো সময় আছে, এখনো পালিয়ে যান!"

বুড়োর কথাবার্তার ধরন দেখে রাগ হল। বিরক্ত কণ্ঠে বললুম, "ঠাট্টা রাখো। শোন। এ বাড়ি আজ থেকেই আমি ভাড়া নিচ্ছি। বৃষ্টি না থামে, আজ আমরা এইখানেই রাত কাটাব। কত টাকা দিতে হবে বল?"

বুড়ো আবার মুখ তুললে—আবার দেখলুম তার চক্ষুকোটরাগত দুই দীপশিখার ঝিলিক। দন্তহীন মুখ ব্যাদান করে নীরব হাসি হেসে সে বললে, "আজ রাতে এখানে থাকবেন? থাকতে পারবেন?"

—"কেন পারব না?"

—"বাড়ির আগেকার মালিক আজ রাতে এখানে আসবেন। তিনি কোথায় থাকেন কেউ তা জানে না, কিন্তু বৃষ্টির রাতে ঠিক এখানে বেড়াতে আসেন। তাঁকে দেখলে মানুষ খুশি হয় না। দোতালার হল-ঘর তাঁর জন্যে খোলাই থাকে। এক বৃষ্টির রাতে ও-ঘরে একটি কাণ্ড হয়েছিল।"

—"কী হয়েছিল?"

—"রক্তাক্ত কাণ্ড! সন্ধ্যার সময় মালিক ফিরে এলেন—তখন ঝুপ-ঝুপ করে বৃষ্টি পড়ছে। হাতে তাঁর বন্দুক, পরোনে তাঁর শিকারের পোশাক। তারপর—না, না, সে-সব কথা আপনাদের আর শুনে কাজ নেই। কিন্তু সেইদিন থেকে এ বাড়ি খালি—এ বাড়ি কেউ ভাড়া নিতে চায় না।"

আমি হো-হো করে হেসে উঠে বললুম, "তুমি কি আমাদের ছেলেমানুষ পেয়েছ, যে যা-তা বলে ভয় দেখাতে চাও?"

—"বেশ, তবে তোমরা থাকো, আমি চললুম। কিন্তু সাবধান, সাবধান, সাবধান!" বলতে বলতে বুড়ো লাঠি ঠক্‌ঠকিয়ে অত্যন্ত ক্ষিপ্রপদে আবার বাগানে নেমে অদৃশ্য হয়ে গেল।

প্রকাশ বললে, "পাগল!"

আমি বললুম, "পাগল নয়, পাজি। বুড়োর হয়ত ইচ্ছা নয়, আর কেউ এ-বাড়ি ভাড়া নেয়। সে একলাই এখানে রাজত্ব করতে চায়। কিন্তু বাইরে যখন ভাড়া-পত্র টাঙানো আছে, তখন আমাদের ভাবনা কী? চল, একবার দোতালার ঘরগুলো দেখে আসি।"

দোতালার বারান্দায় উঠে দাঁড়ালুম। সেখান থেকে অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়।

আরো পুরু, আরো কালো হয়ে উঠেছে আকাশের মেঘ। আরো জোরে, আরো ঘন ধারায় পড়ছে বৃষ্টি……ঝম্‌ঝম্‌-ঝম্‌ঝম্‌! সন্ধ্যার আগেই দ্রুত নেমে আসছে সন্ধ্যার অন্ধকার। দূরের ছোট ছোট পাহাড়গুলো ক্রমেই ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। ত্বই-কূল-ভাসানো নদীর ছবি আঁকা, জল-থই-থই-করা প্রান্তরের মাঝে-মাঝে বড় বড় গাছগুলো মাতাল হয়ে টল্‌মল্‌ করছে ঝোড়ো-বাতাসের দীর্ঘশ্বাসে।

প্রকাশ বিষণ্ণ স্বরে বললে, "বুড়োর একটা কথা কিন্তু ঠিক। আজ এইখানেই বন্দী হতে হবে।"

—"উপায় নেই।"

—"কিন্তু খাবে কী ?"

—"আকাশের জল।"

—"শোবে কোথায় ?"

—"পিছন ফিরে ঐ হল-ঘরটা দেখ। ওর তিনটে দরজাই খোলা। এখনো যেটুকু আলো আছে তাইতেই দেখা যাচ্ছে, ঘরের ভিতরে রয়েছে বড় বড় সোফা, কৌচ আর চেয়ার। দেয়ালের গায়ে রয়েছে সোনালি ফ্রেমে বাঁধানো মস্ত বড় ছবি আর আয়না। মেঝের উপরে কার্পেট পাতা। আশ্চর্য এই, এমন সাজানো বাড়ি খালি পড়ে আছে !"

প্রকাশ সন্দেহ-ভরা কণ্ঠে বললে, "তবে কি বুড়োর কথা মিথ্যা নয় ? এখানা কি—"

—"ভূতের বাড়ি ? ক্ষেপেছ ? তা মানলে বলতে হয়, এ বাড়ির আসল ভূত হচ্ছে ঐ বুড়োই।"

—"বিচিত্র কী। বুড়োর মতন চেহারা আমি কোন মানুষের দেখিনি !"

আচম্বিতে কানে এল অপূর্ব এক সঙ্গীত। হার্মোনিয়াম বাজিয়ে গান গাইছে যেন কোন মেয়ে। রবীন্দ্রনাথের গান। গায়িকার গলা চমৎকার!

সবিস্ময়ে তু-জনে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ ধরে সেই গান শুনলুম।

আকাশে বেড়ে উঠল বিদ্যুতের জীবন্ত অগ্নিচিত্র ও উন্মত্ত বজ্রের চিৎকার। ঘরে-বাইরে কোথাও আর চোখ চলে না।

আমি বললুম, "এ গান আসছে কোথা থেকে?"

প্রকাশ বললে, "ঐ হল-ঘরের ভিতর থেকে।"

বিদেশে আসছি বলে সঙ্গে টর্চ আনতে ভুলিনি। টর্চটা জ্বেলে দু-জনেই হল-ঘরের ভিতরে ঢুকলুম। সব আসন খালি। ঘরের ভিতরে একটি অর্গ্যান রয়েছে, তার সামনেও কেউ নেই।

প্রকাশ তবু জোর করেই বললে, "যে গাইছে সে এই ঘরেই আছে।"

আমি বললুম, "অসম্ভব। অন্য কোন ঘরে কেউ গান গাইছে।"

প্রকাশ অস্বস্তি-ভরা স্বরে বললে, "না, না, গান হচ্ছে এইখানেই। যে গাইছে তাকে দেখতে পাচ্ছি না বটে, কিন্তু আমি তার উপস্থিতি অনুভব করতে পারছি। আমার মনে হচ্ছে, এ ঘরটা যেন হিমালয়ের বরফ দিয়ে গড়া! উঃ কী ঠাণ্ডা! এ মানুষের ঘর নয় বন্ধু, এ হচ্ছে মড়ার ঘর!"

আমরা তাড়াতাড়ি আবার বাইরে গিয়ে দাঁড়ালুম। প্রকাশের কথা মিথ্যা নয়। ঘরের চেয়ে বাহিরটা বেশি গরম—অথচ ঝোড়ো হাওয়ার তোড়ে সেখানে এসে পড়ছিল শীতল বৃষ্টিধারা।

অবাক হয়ে এর কারণ বোঝবার চেষ্টা করছি, এমন সময় কানে এল আর একটা নতুন শব্দ।

গট্-গট্ করে ভারি জুতোর আওয়াজ হচ্ছে।

প্রকাশ বিস্মিত স্বরে বললে, 'সিঁড়ি দিয়ে কে উপরে উঠছে? এ বুড়োর পায়ের শব্দ নয়।"

আমি বললুম, "বুড়ো মিছে কথা বলেছে। এ বাড়ি নিশ্চয়ই খালি নয়। কে গান গায়? কে উপরে ওঠে?" সিঁড়ির দিকে টর্চের আলো ফেলে অপেক্ষা করতে লাগলুম।

সিঁড়ির ধাপগুলো শব্দিত করে উপরের বারান্দায় এসে স্থির হয়ে রইল একজোড়া শিকারী বুট—যা পরলে লোকের হাঁটু পর্যন্ত ঢাকা পড়ে।

নিজের চোখকেও বিশ্বাস করতে পারলুম না—মানুষ নেই, অথচ একজোড়া শিকারী বুট উপরে এসে উঠল জ্যান্ত বীরের মত।

মন বললে, ঐ দৃশ্যমান বুট পরে আছে কোন অদৃশ্য দেহ এবং বারান্দায় হঠাৎ আজ দুই অনাহূত অতিথি দেখে সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে, সবিস্ময়ে।

প্রকাশ অস্ফুট স্বরে বললে, "শিকারী বুট! বুড়োও বলছিল, বৃষ্টির রাতে বাড়ির মালিক এসেছিল শিকারীর পোশাক পরে।"

আমি উত্তর দেবার আগেই বুট-জুতোজোড়া যেন বেজায় ভারি দেহের চাপ নিয়ে আবার গট্-গট্ শব্দে মাটি কাঁপিয়ে অগ্রসর হতে লাগল আমাদের দিকেই।

আমরা মহা আতঙ্কে পিছু হটতে লাগলুম পায়ে পায়ে। আমাদের দৃষ্টি স্তম্ভিত, হৃৎপিণ্ড করছে ধড়্-ফড়্।

হল-ঘরের তৃতীয় দরজার কাছে এসে বুট-জুতোজোড়া আবার থেমে পড়ল—ক্ষণিকের জন্যে। কিন্তু তারপরেই সবেগে প্রবেশ করল ঘরের ভিতরে। গানের স্বর থেমে গেল—সঙ্গে সঙ্গে শুনলুম গুড়ুম্ করে বন্দুকের শব্দ ও তীব্র এক আর্তনাদ।

আমরা পাগলের মত দৌড়ে এক-এক লাফে সিঁড়ির তিন-চারটে করে ধাপ পেরিয়ে নিচে নেমেই দেখি, সেখানে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সেই অদ্ভুত বুড়োর ভাঙা দুম্‌ড়ে-পড়া মূর্তি। সে একবার মুখ তুলে আমাদের পানে তাকালে—টর্চের আলোতে তার চক্ষুকোটরের খুব ভিতরে জ্বলে উঠল দুটো আগুনের কণা।

খিল্-খিল্ করে হেসে বুড়ো খন্‌খনে গলায় বলে উঠল, "মালিকের সঙ্গে দেখা হল? মালিক কী বললে? বাড়ি ভাড়া নেবে নাকি? হি হি হি হি হি!"

দৌড়তে দৌড়তে বাগান পার হয়ে যখন বাইরে এসে পড়লুম, তখনও সেই ভয়াবহ বুড়োর অপার্থিব হাসির শব্দ থামেনি।

হাবুবাবুর কীর্তি-কাহিনী

আমি হচ্ছি হাবুবাবু,—আমাকে মা ভালোবাসেন, বাবা ভালোবাসেন, সবাই ভালোবাসেন।

আমি যেমন লক্ষ্মী ছেলে, আমার মাথাতে বুঝিও খেলে তেমনি। সেদিন দুপুরবেলায় বাবা শুয়ে ঘুমোচ্ছিলেন। ঘুমোতে ঘুমোতে বাবার নাক ডাকছিল।

হঠাৎ আমার মনে হল, আচ্ছা, ঘুমোলেই বাবার নাকের ভেতর থেকে অমনধারা বেয়াড়া আওয়াজ হয় কেন? আমিও তো ঘুমোই, কিন্তু আমার নাককে তো কখনো ডাকতে শুনিনি। (অল্পক্ষণ নীরবে ভাবিয়া)—হুঁ, ঠিক হয়েছে! বাবা যেই ঘুমোন অননি একটা দুষ্টু ঝিঁঝিঁ-পোকা সাঁৎ করে নিশ্চয়ই বাবার নাকের ভেতরে ঢুকে পড়ে। তারপর সেখানে আরামে বসে বসে গান গাইতে শুরু করে। দাঁড়াও দেখাচ্ছি মজা! চট্ করে একটা সন্না নিয়ে এলুম। এই সন্না দিয়ে ঝিঁঝিঁ-পোকাটাকে ক্যাঁক করে চেপে ধরব,—তারপর ব্যাটা আর যায় কোথায়?

দিলুম সন্নাটা বাবার নাকের ভেতরে সড়াৎ করে ঢুকিয়ে। অমনি ঝিঁঝিঁ-ব্যাটার গান গেল থেমে—কিন্তু বাবা উঠলেন "ওরে বাবারে গেছি রে" বলে চেঁচিয়ে। মা ছুটে এলেন "কী হল কী হল" বলে। বাবার নাক দিয়ে তখন ঝর্-ঝর্ করে রক্ত পড়ছে, ঝিঁঝিঁ-পোকাটার পিণ্ডি নিশ্চয়ই চট্‌কে দিয়েছি!

আমি বললুম, "বাবা, তোমার নাকের ভেতরে একটা ঝিঁঝিঁ-পোকা ঢুকেছিল কিনা, তাই—'

বাবা চেঁচিয়ে বললেন, "তোর মুণ্ডু হয়েছিল রে হতভাগা! এঃ, আমার নাকের দফা একেবারে রফা করে দিয়েছে!"

তারপরেই বাবা তুললেন ঘুসি, মা তুললেন চড়,—বেগতিক বুঝে আমি পড়লুম সরে।

তবু, আমি হচ্ছি হাবুবাবু,—আমাকে মা ভালোবাসেন, বাবা ভালোবাসেন, সবাই ভালোবাসেন।

বাবা বলেন, ছেলেমেয়েদের কথায় নির্ভর করা উচিত। নইলে তারা নাকি মানুষ হতে পারে না। মা তাই আমার কথায় খুব নির্ভর করেন।

সেদিন একটা বোমা-লাটাই আর ক-কাটিম সুতো কেনবার জন্যে আমার দেড় টাকার দরকার হল। ঘোষেদের পট্‌লা আর বামুনদের ফট্‌কে কাল থেকে বোমা-লাটাই নিয়ে ঘুড়ি ওড়াচ্ছে ;—তাদের জাঁক আর সহ্য হয় না।

মা বসে বসে চন্দ্রপুলি গড়ছিলেন। থালা থেকে ধাঁ করে দুখানা চন্দ্রপুলি ছোঁ মেরে নিয়ে টপ করে সেদুটো মুখে ফেলে দিয়ে বললুম, "মা, আমাকে গোটা-দেড়েক টাকা দাও তো!"

মা বললেন, "কেন বাছা, টাকা নিয়ে কী করবি?"

আমি বললুম, "সে একটা মজা হবে মা! দাও না টাকা!" বলেই আবার আমি চন্দ্রপুলির থালার দিকে হাত বাড়াচ্ছিলুম, মা কিন্তু তার আগেই থালাখানা আমার নাগালের বাইরে সরিয়ে রেখে বললেন, "যা, এখানে আর গোল করিস নে! আমার বাক্সে খুচরো দেড় টাকা আছে তাই নিয়ে বিদেয় হ। কিন্তু দেখিস বাপু, বাক্সে একখানা পাঁচ টাকার নোটও আছে, ভুল করে যেন সেখানা নিস নে।"

আমি তখনই গিয়ে বাক্স খুললুম। পাঁচ টাকার নোটখানা নিয়ে পট্‌লা আর ফট্‌কের দর্পচূর্ণ করতে ছুটলুম।

তার পরদিন সকালবেলায় বাবার সামনে আমাকে ধরে মা বললেন, "হ্যাঁরে হেবো, কাল তোকে পাঁচ টাকার নোটখানা নিতে মানা করেছিলুম না?"

আমি বললুম, "হ্যাঁ মা, তুমি আমাকে বলেছিলে, যেন আমি ভুল করে পাঁচ টাকার নোটখানা না নিই।"

মা বললেন, "তবে ?"

আমি বললুম, "কেন মা, আমি তো তোমার কথামতই কাজ করেছি। আমি ভুল করে নোটখানা নিই নি,—জেনে-শুনেই নিয়েছি।"

বাবা আমার দিকে এগিয়ে আসতেই আমি সেখান থেকে অদৃশ্য হলুম।

কিন্তু তবু, আমি হচ্ছি হাবুবাবু—আমাকে মা ভালোবাসেন, বাবা ভালোবাসেন, সকলেই ভালোবাসেন।

মাস্টারমশাই সেদিন বললেন, "হাবু, আজ ইস্কুলে যাও নি কেন ?"

আমি দুঃখিতভাবে বললুম, "হায় হায় মাস্টারমশাই! আজ যে দুঃখের দৃশ্য দেখেছি, তাতে আর ইস্কুলে যেতে মন সরল না!"

মাস্টারমশাই বললেন, "তাই নাকি ?"

আমি ফোঁশ্ করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললুম, "আমি ইস্কুলে যাব বলে বাড়ি থেকে বেরিয়েছি, এমন সময়ে দেখি, ঘোষেদের ভোঁদা এক কোঁচড় মার্বেল কিনে পথের ওধার থেকে আসছে। এমন সময়ে, মাস্টারমশাই, একখানা মোটর-গাড়ি—" বলতে বলতে আমার মুখ কাঁদো-কাঁদো হয়ে এল।

মাস্টার ব্যস্ত হয়ে বললেন, "অ্যাঁ, বল কী! তারপর—তারপর ?"

কাঁদো-কাঁদো গলায় আমি বললুন, "তারপর আর কী মাস্টার-মশাই, সে দুঃখের কথা বলতে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে! মোটর-গাড়িখানা কাছে আসতেই ভয়ে ভোঁদার পা পিছলে গেল। আর অমনি সেই এক কোঁচড় মার্বেল কোঁচড় থেকে পড়ে গড়িয়ে গেল একেবারে ড্রেনের ভেতরে।—তাই দেখে আমার আর ইস্কুলে যাওয়া হল না!"

মাস্টারমশাই আমার দিকে একবার কটমট করে চেয়ে বাবাকে এই দুর্ঘটনাটা জানাতে গেলেন।

কিন্তু আমি হচ্ছি হাবুবাবু, আমাকে বাবা ভালোবাসেন, মা ভালোবাসেন, সবাই ভালোবাসেন।

ছোটকাকার রাজভোগ খেতে সাধ হয়েছে। আমায় ডেকে বললেন, "যা তো হাবু, দু-আনার রাজভোগ কিনে আন।"

আমি বললুম, "আমাকে দেবে তো ?"

ছোটকাকা নাচার হয়ে বললেন, "আচ্ছা, আচ্ছা—এখন যা তো।"

খানিক পরে আমাকে মুখ মুছতে মুছতে শুধু হাতে ফিরতে দেখে ছোটকাকা বললেন, "হেবো, আমার রাজভোগ কোথায় ?"

আমি বললুম, "দু-আনায় যে মোটে একটা রাজভোগ দিলে !"

—"হ্যাঁ, তাই তো দেবে। কিন্তু সেটা কোথায় গেল ?"

—"কেন ছোটকাকা, তুমি তো আমায় রাজভোগ দেবে বলেছিলে! আমার ভাগ আমি নিয়েছি। এখন আর দু-আনা পয়সা পেলেই তোমার ভাগ এনে দেব।"

ছোটকাকা আমার কান ধরতে এলেন, কিন্তু আমি ধরতে দিলুম না।

আমার চিৎকার শুনে মা এসে বললেন, "কিরে হেবো, অমন ষাঁড়ের মতন চেঁচাচ্ছিস কেন ?"

আমি বললুম, "চ্যাচাচ্ছি কি সাধে! তোমার আদুরে খোকা আমার চোখে আঙুল ঢুকিয়ে দিয়েছে !"

—"আহা, খোকা যে আবোধ! চোখে আঙুল দিলে লাগে, ও যে তা জানে না !" এই বলে মা চলে গেলেন।

খানিক পরেই খোকার পাড়া-কাঁপানো কান্না শুনে মা ছুটে এসে বললেন, "হাবু, হাবু, খোকা কাঁদে কেন ?"

আমি পিটটান দিতে দিতে বললুম, "খোকা এইবারে জানতে পেরেছে যে চোখে আঙুল দিলে লাগে!"

তবু, আমি হচ্ছি হাবুবাবু—আমাকে বাবা ভালোবাসেন, মা ভালোবাসেন, সবাই ভালোবাসেন।

একরত্তি মাটি

প্রাতরাশের পর মানিক উচ্চস্বরে খবরের কাগজ পাঠ করতে লাগল এবং জয়ন্ত একমনে শুনতে লাগল খবরগুলো।

ভৃত্য মধুর প্রবেশ—সঙ্গে তার এক পাহারাওয়ালা।

জয়ন্ত শুধোলে, "ব্যাপার কী?"

পাহারাওয়ালার মুখে শোনা গেল, ইনস্পেক্টর সুন্দরবাবু এই পাড়ায় তদন্তে এসেছেন, জয়ন্তের সঙ্গে পরামর্শ করতে চান।

জয়ন্ত বললে, "চল মানিক, নিশ্চয় কোন নতুন মামলা। কাগজের একঘেয়ে খবর শোনার চেয়ে নতুন মামলা নিয়ে নাড়াচাড়া করা ভাল।"

মানিক বললে, "হ্যাঁ, তাতে আমাদেরও সময় কাটে, আর সুন্দরবাবুরও হাতযশ বাড়ে।"

গঙ্গার ধার। রেল লাইনের সামনেই একখানা মাঝারি আকারের তিনতালা বাড়ি। সদর দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে দুইজন পাহারাওয়ালা।

বৈঠকখানায় কয়েকজন লোকের সঙ্গে বসে আছেন সুন্দরবাবু। একগাল হেসে বললেন, "এস জয়ন্ত, এস মানিক।"

জয়ন্ত বললে, "আবার কোন নতুন মামলার হামলা সামলাতে এসেছেন বুঝি?"

—"হুম্! তা ছাড়া আর কী? সেইজন্যেই তো আজকে তোমাদের চায়ের আসরে যাওয়া হল না।"

মানিক বললে, "না গিয়ে ভাল করেন নি। মধু আজ চমৎকার খাবার বানিয়েছিল।"

—'কী খাবার ?"

—"চকোলেট স্যাণ্ডউইচ।"

সুন্দরবাবু ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ফেললেন বিরস বদনে।

জয়ন্ত জিজ্ঞাসা করলে, "মামলাটা কিসের ?"

—"কাল এই বাড়ি থেকে পঁচিশ হাজার টাকা চুরি হয়ে গিয়েছে, আর সঙ্গে-সঙ্গে হয়েছে হত্যার চেষ্টা।"

—"তাহলে সামান্য মামলা নয় দেখছি। গোড়া থেকে সব খুলে বলুন।"

২

সুন্দরবাবু যা বললেন তা মোটামুটি এই :

অনন্তচন্দ্র পাইন হচ্ছেন বিখ্যাত লৌহ-ব্যবসায়ী, তাঁর দোকান কলকাতার লোহাপটিতে। এবং তাঁর বসতবাড়ি গঙ্গার ধারে। তিনি বিপত্নীক ও নিঃসন্তান।

তাঁর পিতার দুই বিবাহ। তিনি প্রথম পক্ষের পুত্র। দ্বিতীয় পক্ষের পুত্রের নাম নবীনমাধব, বয়স ছাব্বিশ বছর। তাঁর পিতা পরলোকে। তাঁর বিমাতা ইহলোকেই বিদ্যমান বটে, কিন্তু বাস করেন পিত্রালয়ে; কারণ অনন্তবাবুর সঙ্গে তাঁর বনিবনা নেই। তবে, সপত্নীপুত্র তাঁকে মাসোহারা থেকে বঞ্চিত করেন নি।

অনন্তবাবুর সম্পত্তি স্বোপার্জিত এবং তাঁর অবর্তমানে সেই সম্পত্তির অধিকারী হবে নবীনমাধবই। বিমাতার সঙ্গে না বনলেও অনন্তবাবু তাঁর বৈমাত্রেয় ভাইটিকে ভালোবাসেন যার-পর-নাই এবং তাকে এনে রেখেছেন নিজের কাছেই।

অনন্তবাবুর ম্যানেজারের নাম সুবোধকুমার বসু, লোহার কারবারে

তিনিই তাঁর দক্ষিণ হস্তের মত। দশ বছরের বিশ্বাসী লোক, প্রভুর অনেক টাকা নিয়ে নাড়াচাড়া করেন।

ঘটনার দিন কার্যসূত্রে অনন্তবাবুকে যেতে হয়েছিল আসানসোলে। সেইদিন সন্ধ্যার সময়ে দোকান বন্ধ করে সুবোধ পঁচিশ হাজার টাকা নিয়ে অনন্তবাবুর বাড়ি আসে এবং টাকাগুলি রাখে দোতালার ঘরের লোহার সিন্ধুকে। তারপর ঘরের দরজায় তালা দিয়ে সিন্ধুকের দরজার চাবি নবীনমাধবের হাতে সমর্পণ করে নিজের বাসায় চলে যায়। সে বাস করে গঙ্গার অপর পারে ঘুস্মুড়িতে।

নবীনও সন্ধ্যার পর বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়, ফিরে আসে ভোরের বেলায়। রাত্রিবেলায় বাড়িতে ছিল একজন দ্বারোয়ান ও একজন ভৃত্য। আরো একজন দ্বারোয়ান ও একজন ভৃত্য অনন্তবাবুর সঙ্গেই আসানসোলে গিয়েছিল। পাচক ও দাস দাসী ঠিকা, রাত্রে ছিল না।

সকালে নবীন বাড়ি ফিরে আসবার আগেই ভৃত্য রঘুর নিদ্রাভঙ্গ হয়। সে বাইরে এসে দেখে, উঠোনের উপর পড়ে আছে দ্বারোয়ানের অচৈতন্য দেহ, তার মাথায় প্রচণ্ড আঘাতের চিহ্ন। মাটির উপরে রক্তের ধারা আর একগাছা রুপো-বাঁধানো মোটা রক্তাক্ত লাঠি।

তার চিৎকারে যখন লোকজন জড়ো হয়েছে সেই সময়েই নবীন বাড়িতে ফিরে আসে। তারপর দেখা যায় অনন্তবাবুর ঘরের দরজা খোলা। লোহার সিন্ধুকের দরজাও খোলা, পঁচিশ হাজার টাকা অদৃশ্য। নবীন তৎক্ষণাৎ পুলিশে খবর দেয়।

পুলিশ তদন্তে এই কথাগুলি প্রকাশ পেয়েছে :

দরজার ও লোহার সিন্ধুকের চাবি কাল থেকে আজ পর্যন্ত নবীন একবারও কাছছাড়া করে নি। অথচ দরজার তালা ও সিন্ধুকটা যে চাবি দিয়েই খোলা হয়েছে সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই।

রাত্রে সে কোথায় ছিল এই প্রশ্নের উত্তরে নবীন বলে, এক বন্ধুর বাড়িতে। কিন্তু চেষ্টা করেও তার কাছ থেকে বন্ধুর নাম ও ঠিকানা আদায় করা যায়নি।

দ্বারোয়ানের দেহের কাছে মোটা লাঠিগাছা পাওয়া গিয়েছে, তার অধিকারী যে স্বয়ং নবীন, সেটাও প্রমাণিত হয়েছে।

ভৃত্য রঘু বলে, রাত্রে সে কোন শব্দ শোনে নি। দ্বারোয়ান তাকে সিদ্ধি খাইয়ে দিয়েছিল। সিদ্ধি খেতে সে অভ্যস্ত নয়, ঘুমিয়ে একেবারে বেহুঁস হয়ে পড়েছিল।

অপরাধী যে কেমন করে বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করেছিল, এ সমস্যার কোনই সমাধান হয়নি। সদর দরজা রঘু নিজের হাতে বন্ধ করেছিল। বাহির থেকে বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করবার দ্বিতীয় কোন উপায়ই নেই।

দ্বারোয়ানই কি কড়া-নাড়া শুনে অপরাধীকে দরজা খুলে দিয়ে পরে তার দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে? এ প্রশ্নেরও জবাব পাবার উপায় নেই। কারণ, দ্বারোয়ান এখনো অজ্ঞান হয়ে হাসপাতালে পড়ে আছে।

৩

সমস্ত শুনে জয়ন্ত মুখে কিছু বললে না। বাড়ির বাহিরে গিয়ে খানিকক্ষণ এদিকে ওদিকে ঘোরাঘুরি করে আবার ফিরে এসে সদর দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বললে, "সুন্দরবাবু, আপনি ঠিকই বলেছেন। বাহির থেকে এ-বাড়ির ভিতরে আসবার কোন উপায়ই নেই।"

—"তাহলে অপরাধী বাড়ির ভিতরে এল কেমন করে?"

—"এই সদর দরজা দিয়ে।"

—'দরজা তো ভিতর থেকে বন্ধ ছিল।"

জয়ন্ত জবাব দিলে না। নিচের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ সে উবু হয়ে বসে পড়ল। তারপর মাটির উপর থেকে কি একটা তুলে নিয়ে চোখের কাছে রেখে পরীক্ষা করলে। তারপর পকেটের ভিতর থেকে এক টুকরো কাগজ বার করে জিনিসটা মুড়ে রাখলে।

সুন্দরবাবু সুধোলেন, "কী ওটা ?"

জয়ন্ত উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "একরত্তি মাটি।" সে নতমুখে এদিকে ওদিকে চোখ বুলোতে বুলোতে অগ্রসর হল। উঠোনের উপরে আবার বসে পড়ল। আবার কি তুলে নিয়ে মোড়কের ভিতরে রেখে উঠে দাঁড়াল।

সুন্দরবাবু বললেন, "আবার কী পেলে হে ?"

—"আবার একরত্তি মাটি।"

—"খালি-খালি মাটি কুড়িয়ে ছেলেখেলা কেন! কাজের কথা বল।"

—"দোতালায় চলুন। যে ঘর থেকে টাকা চুরি গিয়েছে সেইখানে।"

কিন্তু সেখানে নতুন কিছুই আবিষ্কৃত হল না।

জয়ন্ত বললে, "এ মামলায় একটা মস্ত সূত্র হচ্ছে নবীনের রক্তাক্ত লাঠিগাছা।"

"হুম্, আরো দুটো বড় সূত্র আছে। প্রথম, নবীনের কাছে ছিল দরজার আর সিন্ধুকের চাবি। দ্বিতীয়, কাল কোথায় রাত্রিবাস করেছিল, সে-কথা সে বলতে নারাজ কেন ?"

জয়ন্ত মাথা নেড়ে বললে, "উঁহু, ওরও চেয়ে বড় সূত্র হচ্ছে ঐ লাঠিগাছা।"

—"হ্যাঁ, ঐ সূত্র ধরে আমি নবীনকে গ্রেপ্তার করতে পারি।"

—"আপাতত সে চেষ্টা করবেন না।"

—"যদি সে পালায় ?"

—"আমি নবীনের মুখ দেখেছি। বুদ্ধিমানের মুখ। বোকার মতন এখন পালিয়ে গিয়ে সে নিজেই নিজের পায়ে কুড়ুল মারবে না।"

—"ঐ নবীন আর সুবোধ এইদিকে আসছে। ওদের কিছু জিজ্ঞাসা করবে কি ?"

নবীন ও তার পিছনে-পিছনে সুবোধ এসে দাঁড়াল জয়ন্তের

সামনে। নবীনের মুখশ্রী, দেহের গঠন ও গায়ের রং চমৎকার। চোখের চাহনি শিশুর মতন সরল। কিন্তু কারুর মুখ দেখে পুলিশ ভোলে না। কারণ এমন অপরাধীর সংখ্যাও অল্প নয়, যাদের মতন দেববাঞ্ছিত চেহারা পেলে মুনি-ঋষিরাও নিজেদের ভাগ্যবান মনে করতেন।

সুবোধের চেহারাও নিরীহ গোছের। শ্যামবর্ণ, দোহারা দেহ, মাথায় মাঝারি, মুখ হাসি-হাসি। চেহারায় কোন বৈশিষ্ট্য না থাকলেও মানুষটিকে মন্দ বলে মনে হয় না।

জয়ন্ত বললে, "আসুন নবীনবাবু। বলতে পারেন, দ্বারোয়ানের দেহের পাশে আপনার লাঠিগাছা পাওয়া গেছে কেন?"

শুষ্ক কণ্ঠে নবীন বললে, "কেমন করে বলব মশাই, আমার নিজের মনেও বার বার জাগছে ঐ প্রশ্নই। আমি হতভম্ব হয়ে গিয়েছি।"

সুবোধের দিকে ফিরে জয়ন্ত বললে, "শুনলুম আপনার বাড়ি ঘুসুড়িতে। আপনি কি রোজ সেখান থেকে আনাগোনা করেন, না কলকাতাতেও কোন বাসা রেখেছেন?"

সুবোধ বললে, "গঙ্গার এপারে কলকাতা, ওপারে ঘুসুড়ি। দূর তো বেশি নয়, তাই ঘুসুড়ি থেকেই আনাগোনা করি।"

—"অনন্তবাবু আপনাকে অত্যন্ত বিশ্বাস করতেন?"

সুবোধ ভাঙা-ভাঙা গলায় বললে, "কিন্তু কালকের ঘটনার পরও তিনি আর কি আমাকে বিশ্বাস করবেন?"

নবীন বললে, "আমি কেমন করে দাদার কাছে মুখ দেখাব জানি না।"

জয়ন্ত বললে, "আপনাদের বেয়ারা রঘুকে একবার এখানে আসতে বলুন।"

রঘু এলে পর সে জিজ্ঞাসা করলে, "তোমাদের সদর দরজা থেকে উঠোন পর্যন্ত রোজ ধোয়া-মোছা, ঝাঁট দেওয়া হয়?"

রঘু হাতজোড় করে বললে, "হ্যাঁ হুজুর, দু-বেলাই। কর্তাবাবু কোথাও একতিল ধুলো দেখলে রেগে আগুন হয়ে ওঠেন।"

ঘরের জানলা দিয়ে গঙ্গার দিকে তাকিয়ে জয়ন্ত বললে, "এত কাছে গঙ্গা, তোমরা নিশ্চয় রোজ গঙ্গাস্নান কর?"

—"না হুজুর, গঙ্গায় স্নান করতে যাই কালে-ভদ্রে।"

—"কাল সকালে কি বৈকালে তোমাদের কেউ গঙ্গাস্নানে যায় নি?"

—"না হুজুর।"

—"সুন্দরবাবু, আমার আর কিছু জিজ্ঞাস্য নেই। এস মানিক।"

জয়ন্ত ও মানিকের সঙ্গে-সঙ্গে সুন্দরবাবুও নিচে নেমে সুধোলেন, "কী হে ভায়া, উঠোন ঝাঁট দেওয়া, গঙ্গাস্নান করার সঙ্গে টাকা চুরির সম্পর্কটা কোন্‌খানে?"

—"এখন বুঝবেন না।"

—"নতুন কোন সূত্র পেয়েছ বুঝি?"

—"পেয়েছি। সবচেয়ে বড় সূত্র।"

—"সূত্রটা কী?"

—"একরত্তি মাটি।"

জয়ন্তের দিকে ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে থেকে সুন্দরবাবু বললেন, "হুম, তুমি একটি আস্ত বাতুল!"

পথ দিয়ে যেতে যেতে মানিক বললে, "আমিও একরত্তি মাটির মানে বুঝলুম না। তুমি এখন কী করবে?"

—"তথ্যানুসন্ধান। আমার বিশ্বাস, এটা জটিল মামলা নয়। চোর ধরা পড়তে বেশি বিলম্ব হবে না।"

—"কারুকে তুমি সন্দেহ করেছ?"

—"কারুকে না, কারুকে না। অর্থাৎ সকলকেই। নবীন, সুবোধ থেকে শুরু করে এ বাড়ির পাচক, দ্বারোয়ান, বেয়ারা, দাসী সকলকেই। অথবা চোর হচ্ছে কোন অজ্ঞাত ব্যক্তি, কিন্তু তা হলেও

বাড়ির কেউ-না-কেউ যে তাকে কোন-না-কোন সাহায্য করেছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাস্তি। আর, কোন্ দিক থেকে সে এসেছে, তাও আমি বুঝতে পেরেছি।"

—"কী দেখে বুঝলে?"

—"একরত্তি মাটি।"

—"জয়ন্ত, তোমার নাগাল পাওয়া ভার!"

৪

এক, তুই, তিন দিন কেটে গেল। জয়ন্ত মাঝে-মাঝে বেরিয়ে যায়, ফিরে আসে; কিন্তু মুখে কিছু বলে না।

চতুর্থ দিনের প্রভাতী চায়ের আসর। সুন্দরবাবুও যথারীতি উপস্থিত।

টেলিফোনের ঘণ্টি বেজে উঠল। জয়ন্ত রিসিভার ধরে বললে, "হ্যালো! হ্যাঁ, আমি জয়ন্ত। নমস্কার। কী বললেন? যাকে খোঁজা হচ্ছে তাকে পেয়েছেন? অতিশয় সুসংবাদ। তার নাম কী? রামলাল? বেশ, বেশ। তাকে আজ তুপুরেই আমার কাছে পাঠিয়ে দিতে পারবেন? আচ্ছা, ধন্যবাদ।"

সুন্দরবাবু সুধোলেন, "কিসের সুসংবাদ জয়ন্ত?"

জয়ন্ত বললে, "সুন্দরবাবু, আজ বৈকালে অনন্তবাবুর বাড়ির সকলেই যেন এক জায়গায় হাজির থাকে, এমনকি পাচক পর্যন্ত।"

কৌতূহলে প্রদীপ্ত মুখে সুন্দরবাবু বললেন, "কেন জয়ন্ত, কেন?"

—"সকলের সঙ্গে আমি রামলাল নামে এক ব্যক্তির পরিচয় করিয়ে দিতে চাই।"

—"কে রামলাল?"

—"ব্যস, এখন আর কোন প্রশ্ন নয়।" এই বলে জয়ন্ত একেবারে বোবা হয়ে গেল।

বৈকাল। অনন্তবাবুর বাড়ির সবাই বৈঠকখানায় হাজির। টেবিলের সামনের চেয়ারখানা দখল করেছেন সুন্দরবাবু।

জয়ন্ত ও মানিকের আবির্ভাব। তাদের পিছনে আর-একজন লোক। তার খালি পা, কোমরে বাঁধা কাপড়, গায়ে গেঞ্জি। জাতে বোধহয় সে বেহারী।

জয়ন্ত বললে, "সুন্দরবাবু, এই লোকটির নাম রামলাল।"

—"হুম্!"

—"নবীনবাবু, ঘটনার দিন আপনি কোথায় রাত্রিবাস করেছেন বলবেন না?"

নবীন কাঁচুমাচু মুখে বললে, "আমাকে মাপ করুন!"

—"বেশ, আপনাকে তা আর বলতে হবে না, কারণ আমি আপনার গুপ্ত কথা জানতে পেরেছি।"

নবীনের মুখ হয়ে উঠল উদ্বিগ্ন।

জয়ন্ত বললে, "রামলাল, সেই রাত্রে এই নবীনবাবু কি তোমার নৌকো ভাড়া করেছিলেন?"

রামলাল বললে, "না হুজুর।"

—"তবে?"

রামলাল অঙ্গুলি-নির্দেশে দেখিয়ে দিলে সুবোধকে।

জয়ন্ত বললে, "সুবোধবাবু, ঘটনার দিন রাত্রে আপনি রামলালের নৌকো ভাড়া করেছিলেন কেন?"

সুবোধের চেহারা তখন আর নিরীহের মত দেখাচ্ছিল না। সে গর্জন করে বলে উঠল, "মিথ্যা কথা, মিথ্যা কথা!"

—"কিন্তু রামলাল আপনাকে সনাক্ত করছে।"

—"ও ভুল দেখেছে।"

—"বেশ, আদালতে গিয়ে এই কথাই বলবেন। সকলে এখন আমার কথা শুনুন।"

৫

জয়ন্ত বলতে লাগল :

"সুন্দরবাবু, আগেই আপনাকে বলেছিলুম, এ মামলায় একটা মস্ত সূত্র হচ্ছে, নবীনবাবুর রক্তাক্ত লাঠিগাছা।

নবীনবাবু যদি ঐ লাঠি দিয়ে দ্বারোয়ানকে আঘাত করতেন, তাহলে নিশ্চয়ই নিজের বিরুদ্ধে অত বড় প্রমাণটা একান্ত নির্বোধের মত ঘটনাস্থলে ফেলে রেখে যেতেন না।

এ থেকেই বোঝা যায়, তাঁর বিরুদ্ধে হয়েছিল একটা নিষ্ঠুর চক্রান্ত। নবীনবাবুর দিকে পুলিশের সন্দেহ আকৃষ্ট করে অপরাধী নিরাপদে বাস করতে চেয়েছে যবনিকার অন্তরালে। নবীনবাবুর রক্তাক্ত লাঠি পাওয়া গেছে ঘটনাস্থলে। ঘরের দরজার আর সিন্ধুকের চাবিও ছিল তাঁর কাছে। পুলিশ সহজেই ভ্রমে পড়তে পারত।

তার উপরে নবীনবাবু নিজেই ব্যাপারটাকে আরো ঘোরালো করে তুলেছিলেন। তিনি কিছুতেই বলতে রাজি নন, ঘটনার দিন রাত্রে ছিলেন কোথায়। সে গুপ্ত কথা আমি জানতে পেরেছি তাঁর মায়ের কাছে সন্ধান নিয়ে। তিনি ছিলেন তাঁর মায়ের কাছে। অনন্তবাবু তাঁর বিমাতাকে একেবারেই পছন্দ করতেন না। তাঁর সঙ্গে মেলামেশা করলে নবীনবাবু সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হবেন, এই ছিল অনন্তবাবুর কঠিন নির্দেশ। নবীনবাবু রক্তের টানে দাদার অনুপস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু ভয়ে সে কথা স্বীকার করতে পারছিলেন না।

নবীনবাবুর সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়ে আমি আর-একটা সূত্র নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলুম। ঘটনাস্থলে বাড়ির সদর দরজার কাছে আর উঠোনের উপরে পেয়েছিলুম দুই টুকরো মাটি। পরীক্ষা করেই বুঝতে পারলুম, তা গঙ্গামাটি ছাড়া আর কিছুই নয়। রঘু বেয়ারা

বললে, ঘটনার দিন বাড়ির কেউ গঙ্গাস্নানে যায় নি। সে দুইবেলা বাড়ির উঠোন প্রভৃতি ঝাঁট দিয়ে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে রাখে, তবু ওখানে দুই টুকরো গঙ্গামাটি এল কী করে? তুচ্ছ মাটির টুকরো কিন্তু অসামান্য হয়ে উঠল সূত্র হিসেবে।

করলুম কল্পনাশক্তির প্রয়োগ। মন বললে, অপরাধী এসেছে নৌকোয় চড়ে জলপথে। নদীতে তখন ভাঁটা ছিল, তাকে নামতে হল ভিজে মাটির উপরে। তার জুতোর তলায় লেগে রইল এঁটেল মাটি। সেই মাটি কিছু ঝরে পড়েছে ঘটনাস্থলে।

গঙ্গার অপর পারে ঘুসুড়িতে বাস করে সুবোধ। সে কেমন লোক? ঘুসুড়ির পুলিশ সন্ধান নিয়ে সে খবর আমাকে জানিয়েছে। সুবোধ হচ্ছে বিষম জুয়াড়ি। ঋণে সে ডুবে আছে। তার নৈতিক চরিত্রও ভাল নয়। হাতে পঁচিশ হাজার টাকা, অনন্তবাবু অনুপস্থিত; এ সুযোগ হয়ত সে ছাড়তে পারে নি। তার পক্ষে সিন্ধুকের আর দরজার তালার দ্বিতীয় চাবি তৈরি করে নেওয়াও কিছুমাত্র কঠিন নয়। সে যদি নৌকো ভাড়া করে ঘুসুড়ি থেকে এসে থাকে, তবে নৌকোর মাঝিরও সন্ধান পাওয়া যেতে পারে ঐখানেই। তাই পাওয়া গেল। ঘুসুড়ির পুলিশই খুঁজে বার করেছে মাঝি রামলালকে।

কিন্তু সুবোধ বাড়ির ভিতরে ঢুকল কেমন করে? আমার অনুমান, রঘু বেয়ারাও এই ষড়যন্ত্রের মধ্যে আছে। সে-ই সুবোধকে সদর দরজা খুলে দিয়েছে। সে কাজ সেরে যখন সরে পড়ছে, সেই সময়েই দ্বারোয়ানের ঘুম ভেঙে যায়। তার পরের কথা আপনারাই অনুসন্ধান করুন।—সুন্দরবাবু, একরত্তি মাটি কি ফ্যালনা?"

সুন্দরবাবু বললেন, "উহুম্, উহুম্!"

যে ছুরি কথা কয়

[পাঠকরা এই গল্পটিকে 'গল্প' বলে উড়িয়ে না দিলেই সুখী হব। কারণ এই গল্প সত্য ঘটনা অবলম্বনে লেখা—যদিও স্থান, কাল ও পাত্রের নাম কাল্পনিক। কন্যান ডয়েলের শার্লক হোম্‌সের কাহিনীর মধ্যেও কোন-কোনটি যেমন সত্যঘটনামূলক, এই গল্পটিও সেই শ্রেণীর। একটি সম্পূর্ণ সত্য ঘটনা থেকে আমিও এই গল্পের মালমশলা গ্রহণ করেছি। ইতি—লেখক।]

১

কুমার চেঁচিয়ে রবীন্দ্রনাথের 'মানসী'র কবিতা পড়ছিল এবং বিমল তার পাঠ শুনছিল একমনে।

এমন সময়ে বৈঠকখানায় এসে ঢুকলেন সুধীরবাবু।

সুধীরবাবু হচ্ছেন এ-অঞ্চলের থানার ইনস্পেক্টর। বিমল ও কুমারের সঙ্গে তাঁর চেনাশুনো ছিল। মাঝে মাঝে তাই এখানে এসে তিনি চা পান ও গল্পগুজব করে যেতেন।

তাঁকে দেখে কবিতার বই মুড়ে কুমার বললে, "এই যে সুধীর-বাবু! আজ এমন অসময়ে যে?"

সুধীরবাবু একখানা চেয়ারের উপরে বসে পড়ে বললেন, "আপনাদের কাব্যচর্চায় বাধা দিলুম, কিছু মনে করবেন না! আমি বিশেষ মুস্কিলে পড়ে এসেছি।"

—"মুস্কিল? কী মুস্কিল?"

—"আপনাদের দ্বারা সে মুস্কিল আসান হবার আশা নেই। তবু আপনারা খুব বুদ্ধিমান আর সুন্দরবনে 'অমাবস্যার রাতে'র ব্যাপারে আপনারা পুলিশকে আশ্চর্য সাহায্য করেছিলেন বলেই এই ব্যাপারটা নিয়ে আপনাদের সঙ্গে আমি পরামর্শ করতে এসেছি।"

বিমল বললে, "আমরা হয়ত আপনার কোন কাজেই লাগব না, তবু ব্যাপারটা কী, শুনতে সাধ হচ্ছে।"

সুধীরবাবু চেয়ার নিয়ে আরো এগিয়ে এসে বললেন, "গেল হপ্তায় এ-পাড়ায় একটা রহস্যময় খুন হয়েছে তা জানেন তো?"

কুমার বললে, "হ্যাঁ, কালীপুজোর রাত্রে হরেন্দ্রনাথ বসুকে রাস্তায় কে বা কারা খুন করে পালিয়ে যায়।"

সুধীরবাবু বললেন, "পরদিন সকাল বেলায় আমরা হরেনবাবুর লাস পাই। তিনি অ্যাপোলো থিয়েটার দেখে বাড়ি ফিরছিলেন, পথে কে তাঁকে ছুরি মারে। ছুরিখানা তাঁর বুকেই বেঁধা ছিল।"

—"তারপর?"

—"তাঁর পকেট খুঁজে আমরা টাকাকড়ি কিছুই পাই নি। তাঁর সোনার রিস্ট-ওয়াচ, রুপোর সিগারেট কেসও হত্যাকারীর হস্তগত হয়েছে, সুতরাং চুরিই যে এই হত্যার উদ্দেশ্য, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই।"

কুমার বললে, "বোধহয় এখনো আপনি হত্যাকারীর সন্ধান পান নি?"

সুধীরবাবু বললেন, "না। ঐ ছুরিখানা ছাড়া হত্যাকারী তার আর কোন চিহ্নই পিছনে ফেলে যায় নি। ছুরির ফলায় আর তার হাতলে এত বেশি রক্ত মাখা ছিল যে হত্যাকারীর আঙুলের ছাপও আবিষ্কার করতে পারিনি। এ অঞ্চলে যত দাগী বদমায়েস আছে, তাদের গতিবিধির উপরে লক্ষ্য রেখেও কোন ফল হয়নি।"

কুমার জিজ্ঞাসা করলে, "হরেনবাবুর কোন শত্রুর খোঁজ পেয়েছেন?"

—"না। হরেনবাবু খুব নির্বিরোধ, অমায়িক ভদ্রলোক ছিলেন। তাঁকে পেটের ভাবনা ভাবতে হত না, থিয়েটার-বায়োস্কোপ দেখে তিনি আমোদ আহ্লাদেই দিন কাটিয়ে দিতেন। তাঁর বন্ধুবান্ধব আর আত্মীয়রা সবাই তাঁকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন।"

বিমল ধীরে ধীরে বললে, "যে ছুরি দিয়ে খুন করা হয়েছে, সেখানা একবার আমাকে দেখাতে পারেন?"

সুধীরবাবু বললেন, "অনায়াসেই। ছুরিখানা আমি সঙ্গে করেই এনেছি। এই নিন।"—বলে পকেট থেকে কাগজে মোড়া ছুরিখানা বার করলেন।

ছুরিখানা পুরোনো, ও খুবই সাধারণ। তার বাঁট ছয় ইঞ্চি ও ফলার মাপ লম্বায় পাঁচ ইঞ্চি। ফলাটা বাঁটের ভিতর মুড়ে ফেলা যায়।

বিমল একাগ্র মনে ছুরিখানা পরীক্ষা করছে দেখে সুধীরবাবু হেসে বললেন, "ছুরির ভিতরে আর নতুন কিছুই দেখতে পাবেন না। এখানা দেখে যা জানবার তা আমরা জানতে পেরেছি।"

বিমল বললে, "হ্যাঁ, আপনারা অভিজ্ঞ লোক, এসব বিষয়ে আপনাদের কাছ থেকে আমরা অনেক কিছুই শিখতে পারি। তবু ছুরিখানা আজকের মত আমার কাছে রেখে যাবেন?"

সুধীরবাবু বললেন, "তাতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু খুব সাবধানে রাখবেন, কারণ ওইটেই হচ্ছে আমাদের একমাত্র সূত্র—"

বিমল হেসে বললে, "সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন। কাল সকালেই ছুরিখানা আপনি ফেরত পাবেন।"

সুধীরবাবু চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "আজ আসি তাহলে।"

২

পরদিন সকালে বিমল ও কুমার দাবা বোড়ে খেলছে, এমন সময়ে সুধীরবাবু এসে হাজির হলেন।

বিমল গজের একটা চাল দিয়ে বললে, "ঐ টেবিলের উপরে আপনার ছুরি আছে।"

সুধীরবাবু বললেন, "নিশ্চয় নতুন কিছু জানতে পারেন নি?"

বিমল দাবা বোড়ের ছক থেকে মুখ না তুলেই বললে, "আপনার প্রশ্নের উত্তরে আমিও একটা প্রশ্ন করব। এ-অঞ্চলে কটা কোকেনের আড্ডা আছে—অর্থাৎ যে-সব জায়গায় লুকিয়ে কোকেন বিক্রি করা হয়?"

সুধীরবাবু হঠাৎ এই প্রশ্ন শুনে প্রথমটা অবাক হয়ে রইলেন। তারপর বললেন, "এ কথা জিজ্ঞেস করছেন কেন?"

—"কারণ আছে, বলুন না।"

—"আমরা তো বাবুলাল মিত্র লেনের একটা কোকেনের আড্ডার কথাই জানি। ও-আড্ডার উপরে আমাদের নজরও আছে।"

বিমল তখনই উঠে পড়ে বললে, "এস কুমার, সুধীরবাবুর সঙ্গে একবার বাবুলাল মিত্র লেনে ঘুরে আসি।"

কুমার বললে, "কিন্তু আর দু-চাল পরেই আমি যে কিস্তিমাৎ করব।"

বিমল তার হাত ধরে টান মেরে বললে, "আরে রেখে দাও তোমার বাজে কিস্তিমাৎ! এখন জ্যান্ত ঘুঁটি নিয়ে খেলা করার সময় এসেছে, ও কাঠের ঘুঁটি নিয়ে কে আর মাথা ঘামায়?"

......বাবুলাল মিত্র লেন বিমলদের বাড়ির খুব কাছেই। তার একদিকে পাঁচ-ছয়খানা বড় বড় মাটকোঠা। তারই একখানার সামনে দাঁড়িয়ে সুধীরবাবু বললেন, "ঐটে হচ্ছে ছট্টু সর্দারের কোকেনের আড্ডা। এ-অঞ্চলে এর চেয়ে বড় বা ছোট আড্ডা আর নেই।"

কুমার বললে, "সব জেনেও এ আড্ডা আপনারা উঠিয়ে দেন না কেন?"

—"যারা কোকেন বেচে তাদের হাতে-হাতে ধরা বড় সহজ কথা নয়।"

বিমল গলির ওপাশে চেয়ে বললে, "আমার বন্ধু বিপিনের বাড়ি দেখছি ঠিক এই আড্ডার সামনেই! বিপিনের বৈঠকখানায় বসে আমরা এখানকার সব দৃশ্যই দেখতে পাব। চলুন সুধীরবাবু, ঐখানেই গিয়ে আশ্রয় নেওয়া যাক।"

সুধীরবাবু বললেন, "কিন্তু আপাতত কোকেনের আড্ডা নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় তো আমার নেই!"

বিমল কোন জবাব না দিয়ে সুধীরবাবুকে হাত ধরে টেনে নিয়ে চলল।

৩

বিপিনবাবুর বৈঠকখানায় বসে প্রথম দিনটা কেবল বাজে গল্প-গুজবেই কেটে গেল।

দ্বিতীয় দিনেও দুপুর গেল, বিকাল গেল, সন্ধ্যা এল বলে।

সুধীরবাবু বিদ্রোহ প্রকাশ করে বললেন, "বিমলবাবু, হয় আপনার মাথা খারাপ হয়েছে, নয় আপনি অন্যায় ঠাট্টা করছেন। এই যদি আপনার সঙ্গে পরামর্শের নমুনা হয় তাহলে জেনে রাখুন, কাল থেকে আমি আর আপনার বাড়িমুখো হব না।"

বিমল ঘরের জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিল। সে মৃদুস্বরে বললে, "আচ্ছা সুধীরবাবু, ঐ যে লোকটা ছট্টুর আড্ডা থেকে বেরিয়ে আসছে ওকে আপনি চেনেন?"

—"হ্যাঁ, চিনি বৈকি! যদিও আমার এলাকায় থাকে না, তবু ওকে নামজাদা গুণ্ডা বলেই জানি। ওর নাম হচ্ছে খ্যাঁদা, বার-দুয়েক পথে রাহাজানি করে ধরা পড়েছে।"

কুমার দেখলে, একটা মোটা, বেঁটে, কালো লোক ছট্টুর আড্ডা থেকে বেরিয়ে এল। তার গায়ে একটা বেগুনি ফ্লানেলের পাঞ্জাবি, পায়ে লপেটা জুতো, হাতে একগাছা মোটা লাঠি।

বিমল বললে, "ওকে একবার থানায় নিয়ে যেতে পারেন?"

সুধীরবাবু সবিস্ময়ে বললেন, "দাগী পাপীদের আমরা সন্দেহ হলেই ধরতে পারি, কিন্তু ওকে আপনি থানায় নিয়ে যেতে বলছেন কেন?"

—"আগে ওকে নিয়ে থানায় চলুন, পরে সব কথা বলব।"

পনেরো দিনের আগে ছাড়ে না ; সুতরাং আন্দাজ করলুম, হ্যাতকারী এখনো সেই জামাটা ব্যবহার করছে। আর তার যখন কোকেন খাওয়ার কু-অভ্যাস আছে, তখন সে নিশ্চয়ই নিয়মিতভাবে কোকেনের আড্ডায় আনাগোনা করে।”

কুমার বললে, “কিন্তু সে তো ও-জামাটা আর না-পরলেও পারত। তারপর সে যে ঠিক কোকেনের ঐ আড্ডাতেই যাবে, এরও কোন নিশ্চয়তা ছিল না।”

বিমল বললে, “এ কথা আমিও স্বীকার করি। কিন্তু এ-সব ব্যাপারে সর্বপ্রথমে কোন সূত্র আবিষ্কার করাই হচ্ছে বড় কথা। তারপর খানিকটা দৈবের সাহায্যও দরকার হয় বৈকি। প্রত্যেক বড়-বড় ডিটেকটিভই সফল হয়েছেন খানিকটা দৈববলেই। এমনকি পৃথিবীর অধিকাংশ বিখ্যাত ব্যক্তির অমরত্বের মূলে কতকটা এই দৈব লীলাই দেখতে পাবে। দৈবের খানিকটা সাহায্য না পেলে আমরা প্রথম চেষ্টাতেই হয়ত খ্যাঁদাকে ধরতে পারতুম না, কিন্তু ছুরির নীরব কথা যখন শুনতে পেয়েছি, আর শহরে কোকেনের আড্ডাও যখন বেশি নেই, তখন আজ হোক আর দু-চার দিন পরেই হোক সে ধরা পড়ত নিশ্চয়ই। সুধীরবাবু, পুলিশের কাজেও বিজ্ঞান-বোধ আর কল্পনাশক্তি থাকা দরকার।”

—“কল্পনাশক্তি ?”

—“হ্যাঁ, কল্পনাশক্তি। কবিতা পড়লে কল্পনাশক্তি বাড়ে। আমাদের মত আপনিও রবীন্দ্রনাথের ভক্ত হয়ে পড়ুন। কারণ রবীন্দ্রনাথ মানেই হচ্ছে কবিতা।”

বনবাসী অভিশাপ

১

ছেলেবেলা থেকেই আমার বড় শিকারের শখ। ভারতবর্ষের নেটিভ বাঘ, গণ্ডার ও ভাল্লুক প্রভৃতি অনেক চতুষ্পদই আমার হাতে জীবন-জ্বালা নিবারণ করেছে বটে, কিন্তু ওসব পশু বধ করে আমি আর নতুন আনন্দ খুঁজে পাই না।

গেল মহাযুদ্ধের সময় হঠাৎ আমার আফ্রিকায় যাবার সুযোগ উপস্থিত হল—অবশ্য বন্দুকধারী সৈনিক বা শিকারী রূপে নয়, কলম-ধারী কেরানি রূপে। কিন্তু আফ্রিকায় গিয়েও বাঙালী কেরানি আমি ছুটি পেলেই শিকারী মূর্তি ধারণ করতুম। সেই সময়েরই একটি অদ্ভুত কাহিনী আজ আমি তোমাদের কাছে বলতে এসেছি।

আমি তখন আফ্রিকার কিভু অরণ্যে গিয়ে তাঁবু ফেলেছি। এই কিভু অরণ্যের খ্যাতির প্রধান কারণ, গরিলা। এত বেশি গরিলা আর কোথাও দেখা যায় না, সেইজন্যেই এই অরণ্যকে 'গরিলার স্বর্গ' বলে ডাকা হয়। অবশ্য এখানকার এবং এর কাছাকাছি জঙ্গলে কেবল গরিলা নয়,—হাতি, বুনো মহিষ, চিতে বাঘ, হিপোপটেমাস, অজগর, গণ্ডার, সিংহ, ম্যানড্রিল ও আরো অনেক হিংস্র জন্তুও পাওয়া যায়।

গরিলা শিকারে বিপদের ভয় পদে-পদেই। একে তো গরিলারা গায়ের জোরে বাঘ ও সিংহেরও উপরে টেক্কা মারতে পারে, তার উপরে তাদের বুদ্ধির জোরও যে-কোন পশুর চেয়ে বেশি। তারা যখন দঙ্গল বেঁধে জঙ্গলের ভিতরে বেড়িয়ে বেড়ায়, তখন হাতি সিংহ বা গণ্ডার পর্যন্ত তাদের পথ ছেড়ে দিয়ে মানে মানে সরে পড়ে হাঁপ ছাড়ে। কাজেই খুব সাবধানে নদীর ধারে একটা খোলা জমি বেছে নিয়ে আমি তাঁবু ফেললুম।

আমার সঙ্গে ছিল বারোজন কাফ্রি কুলি। এই কুলিদের সর্দারের নাম হচ্ছে মুরু। সে খুব পাকা লোক—বনের ভিতরে শিকারীদের পথ-প্রদর্শক হয়ে মাথার চুল সে পাকিয়ে ধবধবে করে ফেলেছে। মুরু এ অঞ্চলের পথ-ঘাট সব জানে, এখানকার বন্য অসভ্য জাতিদের সঙ্গে তার পরিচয়ও খুব ঘনিষ্ঠ।

প্রথম রাত্রেই কিভুর জঙ্গলে একটা ঘটনা ঘটল। অনেক রাতে আচম্‌কা আমার ঘুম গেল ভেঙে। কেন যে ঘুম ভাঙল তার কারণ কিছুই বুঝতে পারলুম না, কিন্তু কেবলই মনে হতে লাগল যে আমার তাঁবুর ঘুটঘুটে অন্ধকারের মধ্যে যেন মূর্তিমান কোন অজানা বিপদ এসে হানা দিয়েছে। তাড়াতাড়ি ইলেক্‌ট্রিক টর্চটা তুলে নিয়ে তাঁবুর চারিদিকে আলো ফেলে দেখলুম, কিন্তু কোথাও সন্দেহজনক কিছুই আবিষ্কার করতে পারলুম না। কিছু দেখতে পেলুম না বটে, কিন্তু একটা ব্যাপার অনুভব করলুম। তাঁবুর ভিতরে কেমন যেন একটা দুর্গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে—যেন কোন বন্য জন্তুর গায়ের বিশ্রী গন্ধ।

বন্দুকটা তুলে নিয়ে তাঁবুর দরজা খুলে বাইরে গিয়ে দাঁড়ালুম। সামনের খোলা জমি চাঁদের আলোয় ধব-ধব করছে। দূর থেকে নদীর কলরব ভেসে আসছে। নদীর ওপারে ছায়া-মাখা অরণ্যের প্রাচীর নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কোথাও কোন জীবজন্তুর ছায়া পর্যন্ত নেই।

মিথ্যা ভয় পেয়েছি ভেবে আবার তাঁবুর ভিতরে এসে শুয়ে পড়লুম।

২

কিন্তু পরদিন সকালে উঠেই টের পেলুম, কাল রাত্রে আমি মিথ্যা ভয় পাই নি। আমার তাঁবুর ভিতরে সত্যিই কেউ অনধিকার প্রবেশ করেছিল।

কারণ প্রভাতী চা তৈরি করতে গিয়ে আবিষ্কার করলুম, আমার

একটিন বিস্কুট টেবিলের উপর থেকে বিনা নোটিশে অদৃশ্য হয়েছে। একেবারে নতুন টিন, এখনো খোলা হয়নি।

যদি মনে করা যায় তাঁবুর ভিতরে কাল কোন জন্তু এসে হাজির হয়েছিল, তাহলে সে জন্তু টিন নিয়ে যাবে কেন? বিস্কুটের বন্ধ টিন চিনতে পারে, পৃথিবীর কোন বনেই এমন কোন জন্তু বাস করে না। গরিলারা অনেকটা মানুষের মতন দেখতে বটে এবং তাদের বুদ্ধিবলও যথেষ্ট, কিন্তু এয়ার-টাইট বন্ধ টিনের মধ্যে যে খাবার থাকে, এটা আন্দাজ করবার শক্তি নিশ্চয়ই তাদের নেই।

তবে?—আর কিছু নয়, নিশ্চয়ই আমার কোন লোভী কুলি এই কাজ করেছে।

তখনি চেঁচিয়ে মুরুকে ডেকে সব কথা বললুম। মুরু সমস্ত শুনে কুলিদের কাছে গিয়ে খোঁজখবর নিয়ে এসে বললে, "হুজুর, তারা কেউ আপনার বিস্কুটের টিন চুরি করেনি।"

আমি বললুম, "তাই নাকি? তবে কি তুমি বলতে চাও, আমার বিস্কুটের টিন পায়ে হেঁটে বনের ভিতরে হাওয়া খেতে গেছে?"

মুরু মাথা চুলকোতে চুলকোতে বললে, "না হুজুর, বিস্কুটের টিন যে হাওয়া খেতে যায় একথা কখনো আমি শুনিনি। কিন্তু সে যে কোথায় পালিয়েছে কুলিরা তা জানে না।"

আমি আর কিছু বললুম না।

সেদিন সন্ধ্যার সময় হঠাৎ আকাশে মেঘ করে বৃষ্টি নামল। দুপুর-বেলায় একটা বন-মুরগি মেরেছিলুম, তারই মাংসে কারি বানিয়ে পেট ভরিয়ে সেদিন সকাল-সকালই বিছানায় গিয়ে আশ্রয় নিলুম। ভিজে ঝোড়ো হাওয়ায় কিভু অরণ্যের ক্রুদ্ধ কোলাহল-উন্মাদিনী নদীর উচ্ছ্বসিত জল-তরঙ্গের আর্তনাদ ও আমার তাঁবুর চারিদিকে অশ্রান্ত বৃষ্টিনূপুর-ধ্বনি শুনতে শুনতে আমি ঘুমিয়ে পড়লুম। এবং সে রাত্রে আমার স্বপ্নহীন সুখনিদ্রা ভাঙবার জন্যে তাঁবুর ভিতরে আর

কোন বিভীষিকা এসে সাড়া দিলে না। কিন্তু পরদিন সকালে উঠে আবার সেই দুষ্ট চোরের অপকীর্তি জানতে পারা গেল।

আজ আর বিস্কুটের টিন নয়, পেটুক চোর আজ নিয়ে গেছে ভর্তি একটিন চিনি।

এ তো ভারি মুস্কিলে ফেললে দেখছি! আমি এখন কোন শহরে বাস করছি না যে ইচ্ছে করলেই বাজারে গিয়ে টপাটপ পয়সা ফেলে যত খুশি খাবার কিনে আনব। সভ্যতার কাছ থেকে এত দূরে এই সঙ্গীহীন নিবিড় অরণ্যের মধ্যে এসে রোজ যদি চোরের এমন অত্যাচার সইতে হয় তাহলে দু-চারদিন পরে অনাহারেই মারা পড়তে হবে যে!

অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে আমি তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে গেলুম। কিন্তু সেখানে গিয়েই আর-একটা নতুন জিনিস চোখে পড়ল। কালকের রাত্রের বৃষ্টিতে তাঁবুর দরজার সামনে মাটি ভিজে কাদার সৃষ্টি হয়েছে এবং সেই কাদার উপরে রয়েছে মানুষের পায়ের কয়েকটা স্পষ্ট ছাপ। খুব চিৎকার করে ডাকলুম, "মুরু, মুরু!"

—"হুজুর!" বলে মুরু সেলাম ঠুকে দাঁড়াল।

—"মুরু, আজ আবার আমার চিনির টিন চুরি গিয়েছে।"

—"কাল বিস্কুট, আজ চিনি? বলেন কি হুজুর!"

—"শুধু তাই নয়, চোর যে মানুষ, আজ আমি সে প্রমাণও পেয়েছি। এ-চোর তোমার ঐ কুলিদের দলেই লুকিয়ে আছে।"

—"কেমন করে জানলেন?"

—"ঐ মাটির দিকে তাকিয়ে দেখ।"

মুরু অবাক হয়ে মাটির উপরের সেই দাগগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল—অনেকক্ষণ ধরে। তারপর সেইখানে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে আরো ভাল করে পরীক্ষা করতে লাগল।

আমি জানতুম, আফ্রিকার বনে-জঙ্গলে যারা থাকে, পায়ের দাগ দেখে তারা অনেক কথাই আবিষ্কার করতে পারে। কাজেই এই

দাগগুলো দেখে মুরু কি বলে তা শোনবার জন্যে সাগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগলুম।

মুরু যখন উঠে দাঁড়াল তখন তার মুখে-চোখে যেন কেমন একটা রহস্যের ইঙ্গিত ফুটে উঠেছে।

আমি বললুম, "কেমন মুরু, এখন বিশ্বাস হল তো যে এ চুরি তোমার কুলিদেরই কীর্তি?"

মুরু মাথা নাড়া দিয়ে বললে, "না হুজুর, এ পায়ের দাগ আমার কোন কুলিরই নয়।"

—"কোন কুলিরই নয়? তুমি কি বলতে চাও, এই গহন বনে আমরা ছাড়া আর কোন মানুষ আছে?"

মুরু খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপরে মৃদুস্বরে বললে, "বনে কত রহস্য থাকে তা কে জানে!"

আমি দৃঢ়স্বরে বললুম, "বনের কোন রহস্যের কথাই আমি জানতে চাই না। কিন্তু এই হতভাগা চোরকে আজ আমি হাতে-হাতে ধরতে চাই।"

—"কেমন করে হুজুর?"

—"তাঁবুর সামনের ঐ গাছটার উপরে উঠে আজ রাতে তোমাকে পাহারা দিতে হবে। আর তাঁবুর ভিতরে বন্দুক নিয়ে বসে পাহারা দেব আমি। কিন্তু কুলিদের কারুর কাছেই এসব কোন কথাই তুমি প্রকাশ কোরো না।"

মুরু ঘাড় নেড়ে বললে, "আচ্ছা। কিন্তু হুজুর, আমার আর-একটা কথা আপনি বিশ্বাস করবেন?"

—"কী কথা?"

মুরু আমার আরো কাছে সরে এসে চুপিচুপি ভীত স্বরে বললে, "হুজুর, এই যে পায়ের দাগগুলো দেখছেন এগুলো মেয়েমানুষের পায়ের দাগ।"

আমি স্তম্ভিত মনে ভাবতে লাগলুম মুরু কী বলতে চায়। সে কি ভূত-পেত্নীর কথা বলছে?

৩

দুপুর বেলায় দু-একটা পাখি-টাখি মারবার মতলবে নদীর ধার ধরে এগিয়ে চললুম। ছোট্ট নদীটি এখানে রোদের আভায় চকচকে একটি রুপোর হাঁসুলির মত বেঁকে বনের ভিতরে চলে গিয়েছে, যেন শ্যামলতার স্নিগ্ধ ছায়াকে খুঁজতে। অরণ্যের ভিতরে বিপুলদেহ বনস্পতিদের আশে-পাশে দাঁড়িয়ে বাতাসের তালে তালে দুলছে বাঁশঝাড়ের পর বাঁশঝাড়। এইসব ঝাড়ের কচি-কচি বাঁশ ও পাতা হচ্ছে গরিলাদের প্রধান খাদ্য। কিভুর অরণ্যে বাঁশঝাড়ের সংখ্যা হয় না। সেইজন্যেই গরিলারা এখানে এসে রাজ্য স্থাপন করেছে।

বনে পাখি দেখলুম অনেক, কিন্তু তারা শিকারের পাখি নয়। শ্যামলতার আড়ালে বসে তারা কেউ গান গায়, কেউ পুচ্ছ দুলিয়ে নেচে বেড়ায়, কেউ রামধনু রঙের বিদ্যুতের মত চোখের সামনে দিয়ে উড়ে যায়। এই ভয়াবহ অরণ্যকে তারা রূপে আর সুরে উৎসবময় করে তোলে ; নিষ্ঠুর বন্দুকের জন্যে তারা সৃষ্ট হয় নি।

বনের পাখি আজ আমার উদরের স্বর্গলাভে বঞ্চিত হল বুঝে ধীরে ধীরে আবার তাঁবুর দিকে ফিরলুম। কিন্তু কয়েক পা এগুবার পরেই নদীর ধারে একটা জিনিস আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। বালির উপরে পড়ে কি একটা জিনিস সূর্যের আলোতে জ্বল-জ্বল করে জ্বলছে। কৌতূহলী মনে কাছে গিয়ে অবাক হয়ে দেখলুম, আমার বিস্কুটের টিনটা সেখানে কাত হয়ে পড়ে রয়েছে। বলা বাহুল্য, তার ভিতরে একখানা বিস্কুটও ছিল না।

মহা বিস্ময়ে আমি একেবারে অভিভূত হয়ে গেলুম। মুরু বলে যে-চোর আমার তাঁবুতে ঢুকেছিল সে নাকি স্ত্রীলোক ; কিন্তু ভয়ঙ্কর এই কিভুর গহন বন, নরখাদক ব্যাঘ্র, মত্ত হস্তীর দল এবং তাদের চেয়ে ভীষণ হাজার হাজার গরিলা এখানে মূর্তিমান মৃত্যুর মত

বিচরণ করে, দিনের আলোকেও সাহসী পুরুষরা এখানে প্রবেশ করলে আতঙ্কে মূর্ছা যায়, এমন জায়গায় রাতের বেলায় একাকিনী যে ভ্রমণ করতে পারে, কে সেই সাহসিনী নারী ?……আমি জানি কিভুর অরণ্যের সবচেয়ে কাছে যে গ্রাম আছে, তাও এখান থেকে অন্তত বিশ মাইল দূরে। অত দূর থেকে যে কোন স্ত্রীলোক এসে রোজ আমার খাবার চুরি করবে আর এই হিংস্র জন্তুভরা বনে নিশুত রাতে নদীর ধারে বসে নির্ভয়ে আহার করবে, এ কথা অসম্ভব—সম্পূর্ণ অসম্ভব !

তাহলে এ কে ? এ কি তবে মানুষ নয় ? তবে কি প্রেতাত্মা বলে কোন কিছুর অস্তিত্ব সত্য-সত্যই আছে ?……কিন্তু ভূতের কর্তব্য তো মানুষকে ভয় দেখানো। এ ভূত তো ভয় দেখায় না, ভয়ে-ভয়ে খাবার চুরি করে লুকিয়ে পালিয়ে যায় ! আফ্রিকার ভূত কি এতই ভীতু ?……

সে রাত্রে গাছের ডালে বসে রইল মুরু, আর আমি রইলুম তাঁবুর ভিতরে চেয়ারে বসে। আলো দিলুম নিবিয়ে এবং হাতে রইল তৈরি বন্দুক।

সারা রাত জেগে ঠায় বসে বসে জঙ্গলের নানান জীবজন্তুর গর্জন ও আর্তনাদ শুনতে লাগলুম, কিন্তু যার আশায় বসে আছি তার পদশব্দ শুনলুম না।

ভোরের পাখির গান শুনে বাইরে বেরিয়ে এসে দেখলুম, পূর্ব-আকাশের অঙ্গনে সুন্দরী উষা প্রাত্যহিক হোরির আবির-খেলা শুরু করে দিয়েছে এবং গাছের উপর থেকে নেমে মুরু আসছে আমার তাঁবুর দিকেই।

তিক্ত স্বরে বললুম, "মুরু, আমাদের রাত জাগাই সার হল, চোর এল না।"

মুরু গম্ভীরভাবে বললে, "চোর এসেছিল হুজুর !"

—"এসেছিল ? কোথায় ? কখন ?"

—"ঐ বাঁশঝাড়ের তলায়। কাল শেষ রাতে।"

—"তুমি তাকে দেখলে, অথচ ধরলে না ?"

মুরু ধীরে ধীরে বললে, "কেমন করে ধরব হুজুর ? চাঁদের আলোয় দেখলুম হামাগুড়ি দিয়ে একটা ছায়ামূর্তি বাঁশঝাড়ের তলা থেকে বেরিয়ে এল, তারপর খানিকক্ষণ মাটির উপরে স্থিরভাবে বসে রইল, তারপর বিদ্যুতের মতন আবার ঝুপসি গাছের তলায় কোথায় মিলিয়ে গেল। বোধহয় সে আমাকে দেখতে পেয়েছিল।"

আমি রুদ্ধশ্বাসে বলে উঠলুম, "তার চেহারা কী রকম মুরু ? সে জন্তু, না মানুষ, না—"

—"দূর থেকে কিছুই বুঝতে পারিনি হুজুর।"

আমি দৃঢ়স্বরে বললুম, "মুরু, আজ রাত্রে আর গাছের উপরে নয়, আমার পাশের তাঁবুতে তুমি জেগে বসে থাকবে। আমার তাঁবুতে আমিও জেগে থাকব। এই চোরকে গ্রেপ্তার না করে এখান থেকে আমি নড়ব না।"

৪

রাত বারোটা, একটা, দুটো বেজে গেল। অন্ধকার তাঁবুর ভিতরে একলা আমি শুয়ে আছি। ঘুমের ঘোরে চোখ ভেঙে আসছে, তবু আমি ঘুমোই নি।

অরণ্যের গভীরতার ভিতর থেকে আজও তেমনি জীবন ও মৃত্যুর কোলাহল ভেসে আসছে—কেউ করছে প্রচণ্ড গর্জন, কেউ করছে করুণ আর্তনাদ। গানের পাখিরা এখন গান গেছে ভুলে, মাঝে মাঝে খালি অমঙ্গলের সম্ভাবনা জানিয়ে কর্কশ কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠছে পেচকরা এবং জীবজন্তুর সেইসব শব্দের উপরে আর একটা ভয়ানক শব্দ সারাক্ষণ জেগে রয়েছে, যা অবর্ণনীয়। হুম্-হুম্, হুম্-হুম্—যেন

বনবাসী নিশীথিনীর হৃৎপিণ্ডের অশ্রান্ত শব্দ। সেই অরণ্য-শ্মশানের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হচ্ছে কালরাত্রি, তার ক্ষুধিত নিষ্ঠুর আত্মা যেন তালে তালে হুঙ্কার দিয়ে ক্রমাগত বলে যাচ্ছে—'রক্ত কই? রক্ত চাই! রক্ত কই? রক্ত আন্! রক্ত কই? রক্ত দে!'—বুনো রাতের এই ভাষা বোঝে বলেই হয়ত প্রতি রাত্রে বনে বনে সিংহ জাগে, চিতা হানা দেয়, অজগর পাকসাট মারে!

আচম্বিতে আমার তাঁবুর দরজার পর্দা আস্তে আস্তে সরিয়ে খানিকটা চন্দ্রকিরণ ভিতরে প্রবেশ করল।

তাড়াতাড়ি আমি চোখ মুদে ফেললুম—হয়ত এই চাঁদের আলোর সঙ্গে এখনি সে মূর্তিমান বিভীষিকা তাঁবুর ভিতরে প্রবেশ করবে।

নিবিড় অন্ধকারেও তার চোখ অন্ধ হয় না। আমি জেগে আছি দেখলে হয়ত সে দরজার কাছ থেকেই উঁকি মেরে আবার অদৃশ্য হবে।

কিন্তু কে সে—কে সে! সে জন্তু নয় তা জানি, কিন্তু সে কি মানুষ?

ডান হাতে রিভলভার ও বাম হাতে ইলেকট্রিক টর্চটা প্রাণপণে চেপে ধরলুম।

তারপরেই খুব মৃদু পায়ের শব্দ পেলুম। শব্দটা ক্রমে আমার মাথার কাছে এসে হঠাৎ থেমে গেল। বিষম একটা বোঁটকা গন্ধে চারিদিক বিষাক্ত হয়ে উঠল—যেন কোন বন্য জন্তুর গায়ের গন্ধ।

ফোঁস্ করে একটা তপ্ত নিশ্বাস আমার মুখের উপর এসে পড়ল। বিভীষিকা তাহলে আমার শিয়রে এসে দাঁড়িয়েছে—হয়ত জ্বলন্ত দৃষ্টিতে আমাকেই লক্ষ্য করছে! কিন্তু যদি সে হঠাৎ আমাকে আক্রমণ করে? এই সম্ভাবনা মনে জাগবামাত্রই তীরের মত উঠে পড়লুম—এবং সঙ্গে সঙ্গে টর্চের চাবিও টিপে ধরলুম।

টর্চের আলোকোচ্ছ্বাসের মধ্যে যে মুখখানা দুঃস্বপ্নের মত ফুটে উঠল, সে কি মানুষের মুখ? সে কি স্ত্রীলোকের মুখ? সে কি পুরুষের মুখ?

—দপ্-দপ্ করছে দুটো অগ্নিভরা বুভুক্ষু দৃষ্টি, ঝকমক করছে অনেকগুলো হিংস্র দন্ত, লট-পট করছে রাশীকৃত কুণ্ডলী-পাকানো সাপের মত কেশমালা! তারপরেই আলোকরেখার ভিতর থেকে সেই বিভীষণ মুখখানা বিদ্যুতের মতন সাঁৎ করে সরে গেল।

যত জোরে পারি চেঁচিয়ে উঠলুম, "মুরু! মুরু! মুরু!"

দ্রুত পদধ্বনি—এবং পরমুহূর্তেই তাঁবুর বাইরে বিকট এক অমানুষিক তীব্র গর্জন ও বিষম আর্ত চিৎকার।

এক লাফে আমিও তাঁবুর বাইরে গিয়ে দাঁড়ালুম। উজ্জ্বল চাঁদের আলোয় যা দেখলুম, সে কী দৃশ্য। তাঁবুর দরজার সামনেই মাটির উপরে পড়ে ছটফট করছে হতভাগ্য মুরু এবং মুরুর বুকের উপর পড়ে তার গলা কামড়ে ধরেছে প্রেতিনীর মতন বীভৎস একটা কালো মূর্তি।

আমাকে দেখেই সে আবার গর্জন করে লাফিয়ে উঠল এবং সঙ্গে-সঙ্গে তাকে লক্ষ্য করে আমিও রিভলভারের ঘোড়া টিপে দিলুম।—অত্যন্ত তীক্ষ্ণ এক চিৎকার করে মূর্তিটা মাটির উপরে লুটিয়ে পড়ে স্থির হয়ে রইল।

ঠিক সেই সময়েই গভীর অরণ্যের ভিতর থেকে আর-একটা বিচিত্র ভয়াবহ রোমাঞ্চকর কোলাহল জেগে উঠল—যেন বিরাট অরণ্যের ভয়ঙ্কর বিপুল আত্মা প্রচণ্ড হিংসার নেশায় অধীর হয়ে পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে—এগিয়ে আর এগিয়ে আর এগিয়ে আসছে!

এ আমার বিকৃত মস্তিষ্কের কল্পনা নয়, কিন্তু স্তম্ভিত বিস্ময়ে স্পষ্টই দেখলুম, বনের বড়-বড় বাঁশগুলো টলমল টলমল করে দোল খাচ্ছে, মড়-মড় করে গাছের পর গাছ ভেঙে পড়ছে এবং যেন জীবন্ত

অন্ধকারের একটা সুদীর্ঘ প্রাচীর পৃথিবীকে থর্‌থরিয়ে কাঁপিয়ে আমাদের লক্ষ্য করেই তেড়ে আসছে !

কী করব বুঝতে না পেরে আচ্ছন্নের মতন দাঁড়িয়ে আছি, এমন সময় আমার পিছন থেকে একটা কালো মূর্তি সেই জীবন্ত অন্ধকারের দিকে ছুটে গেল কালবৈশাখীর মতই তীব্র বেগে।

চমকে পিছন ফিরে দেখি, আমার রিভলভারের গুলিতে আহত সেই ভয়াবহ মূর্তিটা আর সেখানে মাটির উপরে পড়ে নেই।

নিজের আহত কণ্ঠদেশে হাত দিয়ে মুরুও তখন উঠে দাঁড়িয়েছে।

হাঁপাতে হাঁপাতে বললুম, "মুরু! মুরু! এ কী ব্যাপার? বনের ভিতরে ও কিসের শব্দ? কী এগিয়ে আসছে?"

যাতনাবিকৃত স্বরে মুরু বললে, "না হুজুর, ওরা আর এগিয়ে আসছে না, ওরা আবার বনের ভিতরে ফিরে যাচ্ছে।"

—"ওরা কারা?"

—"ওরা গরিলা!"

—"গরিলা? ওরা এগিয়েই বা আসছিল কেন, আর ফিরেই বা যাচ্ছে কেন?"

—"মুমা হুজুর, মুমা! মুমা হচ্ছে গরিলাদের মেয়ে, তাকে ফিরে পেয়েই ওরা আবার ফিরে যাচ্ছে।"

—"মুরু, কী তুমি বলছ!"

—"শুনুন হুজুর! এখান থেকে বিশ মাইল তফাতে কাফ্রিদের একটা গ্রাম আছে। মুমা ছিল কাফ্রিদের সর্দারের মেয়ে। তার বয়স যখন দেড় বছর, গরিলারা একদিন এসে তাকে চুরি করে নিয়ে যায়। সেই থেকে গরিলাদের সঙ্গে থেকে মুমাও এখন গরিলাদের মেয়ে হয়ে গেছে। আর কোন মানুষই তাকে দেখতে পায়নি। সে আজ ষোল বছরের কথা।"

অবাক হয়ে নিষ্পলক নেত্রে অরণ্যের দিকে তাকিয়ে রইলুম।

স্বপ্নময় চাঁদের আলোয় চারিদিক রুপোলি ছবির মত অপূর্ব হয়ে উঠেছে।

নদীর সমুজ্জ্বল হীরকখচিত জলবীণায় যে গানের আনন্দ বেজে উঠেছে, তার মধ্যে আর এতটুকু ভয় বা বিষাদের আভাস নেই।

গরিলাদের পোষা মেয়ে মুমা নিশ্চয়ই আর কখনো তার মানুষ-মায়ের কোলে ফিরে আসে নি।

নাটক

অলৌকিক

(নাটকের পোশাকে একটি অসম্ভব গল্প)

১

[সুকোমলের বাড়ির দোতালার কক্ষ। সুকোমলের স্ত্রী সুনীতি ব্যস্তভাবে একবার পথের দিকে জানলার কাছে এগিয়ে যাচ্ছে, আবার ফিরে এসে হতাশভাবে চেয়ারের উপরে বসে পড়ছে। ঢং ঢং করে যেই রাত এগারোটা বাজল, তখনি শুরু হল আমাদের কাহিনী।]

সুনীতি। (চিন্তিত স্বরে) রাত এগারোটা। এখনো ইনি ফিরলেন না কেন? যে-পাষণ্ডের কাছে গিয়েছেন, আমার বড় ভয় করছে। (সিঁড়িতে পায়ের শব্দ) ঐ বুঝি তিনি আসছেন—না, না, ও তো ঠাকুরপোর পায়ের শব্দ।

(পরিমলের প্রবেশ)

পরিমল। বৌদি, দাদা এখনো ফেরেন নি?

সুনীতি। না ঠাকুরপো, আমি ভেবে ভেবে সারা হচ্ছি।

পরিমল। তাইতো, ভাবনারই কথা বটে। একবার তাঁর খোঁজে শঙ্কর উপাধ্যায়ের বাড়ি যাব নাকি?

সুনীতি। না ঠাকুরপো, আমি আর একলা থাকতে পারব না। তুমি তো থানায় গিয়েছিলে, পুলিশ কী বললে?

পরিমল। পুলিশ? তারা তো আমার কথা হেসেই উড়িয়ে দিলে। বললে, 'এটা হচ্ছে ইংরেজ রাজ্যের রাজধানী, বিংশ শতাব্দীতে প্রকাশ্যে এখানে কোন অপার্থিব ভয়ঙ্করের আবির্ভাব হতে পারে না।' আমি বললুম, 'মশাই, আপনারা জানেন না, শঙ্কর উপাধ্যায় হচ্ছে প্রেতসিদ্ধ!' তারা তো হো হো করে হেসেই অস্থির। বলে, 'পুলিশের

কেতাবে প্রেত বলে কোন কথা নেই।' তারপর তাদের অনেক বোঝাবার আর কাকুতি মিনতি করবার পর ইন্সপেক্টার বললে, 'আচ্ছা, রাত বারোটার সময় আমি যখন রোঁদে বেরুব, তখন তোমাদের বাড়ির কাছটা একবার ঘুরে আসব।'

সুনীতি। ঠাকুরপো, এই শঙ্কর উপাধ্যায়কে তুমি কখনো দেখেছ ?

পরিমল। দেখেছি বৈকি ! বার-তিনেক দেখেছি।

সুনীতি। কী-রকম তাকে দেখতে ?

পরিমল। তাকেই তো বলা চলে মূর্তিমান ভয়ঙ্কর !

সুনীতি। (সভয়ে) ভয়ঙ্কর !

পরিমল। হ্যাঁ বৌদি ! মাথায় সে প্রায় সাড়ে-ছয় ফুট উঁচু। গায়ের রং তার অমাবস্যার অন্ধকারে মিশিয়ে যায়। তার ঘন-কালো মুখের উপরে ভাঁটার মত গোল চোখদুটো থেকে বেরোয় যেন অসহ্য আগুনের তীব্রতা। সে-চোখদুটোতে চোখ মিলিয়ে তাকিয়ে থাকা অসম্ভব। তার কালো কপালের উপরে জ্বলতে থাকে উজ্জ্বল সিঁদুরের সুদীর্ঘ রেখা। পরনে তার লাল-টকটকে চেলির কাপড় আর উত্তরীয়। যখন সে কথা কয়, তখন তার হিংস্র বাঘের মত চকচকে ক্রূর দাঁত-গুলোর উপরে ফুটে ওঠে ক্ষুধিত নিষ্ঠুরতার ইঙ্গিত ! ও-রকম দাঁত আর কোন মানুষের মুখে দেখিনি ! উঃ, ভয়াবহ !

সুনীতি। এত শক্তি হল তার কেমন করে ?

পরিমল। তা আমি ঠিক বলতে পারি না। তবে, লোকের মুখে তার অনেক কথাই শুনেছি। সে নাকি অনেকবার শব সাধনা করেছে। সে নাকি মহামাংসও খেয়েছে !

সুনীতি। মহামাংস ! মহামাংস কী ঠাকুরপো ?

পরিমল। কালীমূর্তির সামনে নরবলি দিয়ে যে বলি-দেওয়া মাংস খাওয়া হয়।

সুনীতি। (শিউরে উঠে) বলো কি ঠাকুরপো, মানুষ কখনো মানুষের মাংস মুখে তুলতে পারে ?

পরিমল। মানুষে পারে না, কিন্তু পিশাচে পারে। শঙ্কর উপাধ্যায়কে আমি সাক্ষাৎ নরপিশাচ বলেই মনে করি। সে সব করতে পারে।

সুনীতি। কিন্তু ইংরেজ-রাজত্বে নরবলি দেয় কেমন করে?

পরিমল। বৌদি, ইংরেজ-রাজত্বে নরহত্যাও তো নিষিদ্ধ। তবু এখানে কি নিত্যই নরহত্যা হয় না? আর হত্যাকারী কি সব সময়েই ধরা পড়ে? শঙ্কর উপাধ্যায় সত্যই যদি নরবলি দিয়ে থাকে, তাহলে নিশ্চয়ই প্রকাশ্যে দেয়নি।

সুনীতি। আচ্ছা ঠাকুরপো, শ্মশান-জাগানো, ভূত-প্রেত নামানো, শব-সাধনা, এ-সব কি তুমি বিশ্বাস কর?

পরিমল। বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না।

সুনীতি। শব-সাধনায় সিদ্ধিলাভ করলে সত্যিই কি কেউ অলৌকিক শক্তির অধিকারী হয়?

পরিমল। ও-বিষয়েও আমার বিশেষ কোন জ্ঞান নেই। সবাই জানে, সাধক রামপ্রসাদ আর নাটোরের মহারাজা রামকৃষ্ণ শব-সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। কিন্তু তাঁরা কোনদিন অলৌকিক শক্তির খেলা দেখিয়েছেন বলে তো শুনিনি। ম্যাজিক দেখাবার জন্যে বা শয়তানি শক্তি অর্জন করবার জন্যে কোন সাধু লোক শব-সাধনায় নিযুক্ত হয় না। শব-সাধনা হচ্ছে ধর্মসাধনারই একটি অঙ্গ।

সুনীতি। তবু শঙ্কর উপাধ্যায়কে তোমরা সাধু বল না কেন?

পরিমল। শব-সাধনায় বসে সে অর্জন করেছে পশুশক্তি। সে ভগবানের বর চায়নি, চেয়েছে শয়তানের আশীর্বাদ।

সুনীতি। কিন্তু সে আমাদের কাছ থেকে কী চায়?

পরিমল। আমি জানি না। তুমিও কি জানো না?

সুনীতি। না।

পরিমল। দাদা তোমায় বলেন নি?

সুনীতি। না। আমি তো আগে জানতুম, তোমাদের বোনের বিয়ের সময় উনি ঐ লোকটার কাছ থেকে দু-হাজার টাকা ধার

করেছিলেন। সেই ধারের টাকা সুদে আসলে বেড়ে এখন দাঁড়িয়েছে সাড়ে তিন হাজার টাকায়। কিছুদিন আগে থেকেই সেই ধার শোধ করবার জন্যে শঙ্কর উপাধ্যায় তোমার দাদাকে রীতিমত চেপে ধরে। তোমার দাদা অনেক কষ্টে সব টাকা জোগাড় করে ধার শোধ দিতে যান। কিন্তু শঙ্কর উপাধ্যায় এখন আর টাকা নিতে রাজি হচ্ছে না।

পরিমল। কেন?

সুনীতি। কেন তা জানি না।

পরিমল। এ তো ভারি আশ্চর্য কথা! আর এ-জন্যে দাদাই বা এত ভয় পেয়েছেন কেন? শঙ্কর যদি টাকা নিতে নারাজ হয় আর দাদার নামে নালিশ করে, তাহলে টাকা তো কোর্টে জমা দিলেই সব গোল মিটে যায়।

সুনীতি। তোমার দাদা বলেন সে নাকি কোর্টে নালিশ করতেও চায় না।

পরিমল। কী মুস্কিল, তবে কী চায় সে?

সুনীতি। তোমার দাদাই জানেন।

পরিমল। এ-রহস্যের কিছুই তো বুঝতে পারছি না। সুদে-আসলে সব টাকা ফিরিয়ে পেলে আর কী দাবি করবার অধিকার আছে তার? তুমি কি এ-সম্বন্ধে দাদাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করনি?

সুনীতি। করেছিলুম বৈকি! কিন্তু তিনি কোন জবাব দেন না, বোবার মতন একেবারে চুপ করে থাকেন।

পরিমল। দাদার এই নীরবতার কারণ কী?

সুনীতি। তোমার দাদাই জানেন। তবে এইটুকু বুঝেছি, শঙ্কর এমন কিছু চায়, তোমার দাদার পক্ষে যা দেওয়া সম্ভব নয়। অথচ শঙ্কর বলছে তার ইচ্ছা পূর্ণ না করলে আমাদের বাড়িতে সে পাঠিয়ে দেবে ভয়ঙ্করকে।

পরিমল। হুঁ, ভয়ঙ্কর! কিন্তু এই ভয়ঙ্কর কে? আমি তো ভয়ঙ্কর বলে মনে করি শঙ্কর উপাধ্যায়কেই।

সুনীতি। তাহলে শঙ্কর কি নিজেই আমাদের বাড়িতে আসবে?

পরিমল। বৌদি, আমরা ভয় পাচ্ছি বটে, কিন্তু মাঝে-মাঝে
এটাও মনে হচ্ছে, সে নিজে এখানে এসে কী করতে পারে? এখানে
দাদা আছেন, আমি আছি, পাড়ার লোকজনরাও আছে—তার উপরে
পুলিশের লোকও আসতে পারে। আমরা এতগুলো লোক মিলে কি
ঐ একটা পাষণ্ডকেও দণ্ড দিতে পারব না? আমি অনেক দিন ধরে
লাঠি-খেলা শিখেছি, আমি একলাই লাঠি মেরে শঙ্করের সমস্ত
লম্ফঝম্প বন্ধ করে দিতে পারি।

সুনীতি। না ঠাকুরপো, ব্যাপারটা বোধহয় অত সহজ নয়।
হয়ত কেবল শঙ্করের জন্যেই তোমার দাদা ভয় পাচ্ছেন না। তার
দাবির পিছনে হয়ত লুকানো আছে অন্য কোন অর্থ।

পরিমল। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই গভীর কোন অর্থ! দাদা আমার দুর্বলও
নন, কাপুরুষও নন,—তিনি হচ্ছেন ডাক্তার। আর আমি মনে করি,
হৃদয় যাদের সবল নয়, ডাক্তারি পেশায় কোনদিনই তারা সফল হতে
পারে না। তাই তো ভাবছি, দাদা যখন ভয়ে এমন কাতর হয়ে পড়েছেন,
তখন এই রহস্যের মধ্যে নিশ্চয়ই আছে কোন ভয়ঙ্কর সঙ্কেত।

সুনীতি। উনি তো এখনো এলেন না। আমার বুক যে কেমন
করছে ঠাকুরপো, মনে হচ্ছে এখনি কি যেন একটা অঘটন ঘটবে!

পরিমল। কোন অঘটন ঘটবে না বৌদি, তুমি এখনি অতটা
উতলা হয়ো না।

(সিঁড়িতে দ্রুত পায়ের শব্দ)

সুনীতি। (সানন্দে) ঐ উনি আসছেন—আঃ, বাঁচলুম!

(সুকোমলের প্রবেশ)

সুকোমল। (উত্তেজিত কণ্ঠে) সুনীতি, সুনীতি, সমস্তই ব্যর্থ হল!

পরিমল। কী ব্যর্থ হল দাদা?

সুকোমল। এত হাতে-পায়ে ধরা, এত অনুরোধ উপরোধ!
শঙ্কর উপাধ্যায় আমার কোন কথাই শুনবে না!

পরিমল। কেন শুনবে না দাদা ? তুমি তো ধারের টাকা শোধ দিতেই গিয়েছিলে।

সুকোমল। শুধু ধারের টাকা নয় পরিমল, আমি তার পাওনা সুদের উপরেও আরো পাঁচশো টাকা বেশি দিতে চেয়েছিলুম।

পরিমল। (সবিস্ময়ে) তবু সে টাকা নিতে রাজি হল না ?

সুকোমল। না।

পরিমল। এমন কথাও তো কখনো শুনিনি।

সুকোমল। নোটের তাড়া সে আমার মুখের উপরে ছুঁড়ে ফেলে দিলে।

পরিমল। বেশ তো, সে যখন ইচ্ছে করেই টাকা নিচ্ছে না, তখন তোমার আর দায়িত্ব কিসের।

সুকোমল। সে টাকা চায় না, তার বদলে চায় অন্য কিছু।

পরিমল। তার দাবি যে কী, তাই তো জানতে পারছি না। শুনছি, তুমি নাকি বৌদির কাছেও সে কথা জানাও নি।

সুকোমল। (গম্ভীর স্বরে) সে জানাবার কথা নয় পরিমল।

পরিমল। তবে বল দাদা, তুমি কেন এত ভয় পাচ্ছ ?

সুকোমল। পরিমল, দুরাত্মা শঙ্কর এমন কিছু চায় আমার পক্ষে যা দেওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব।

পরিমল। (অধীর স্বরে) কিন্তু সে কী চায় তাই বল না।

সুকোমল। (গম্ভীর স্বরে) সে চায় তোমার বৌদিদিকে।

পরিমল। (সগর্জনে) কী ?

সুনীতি। (আর্ত স্বরে) ও মা।

সুকোমল। শঙ্কর বলে, তার সাধনায় ব্যাঘাত হচ্ছে, বীরাচারী তান্ত্রিকের সাধনায় নাকি ভৈরবীর দরকার হয়। সুনীতিকে সে চায় ভৈরবী রূপে গ্রহণ করতে।

পরিমল। অসম্ভব! অসম্ভব!

সুনীতি। আমি যাব না, আমি যাব না!

সুকোমল। শঙ্কর বলে, ভৈরবী রূপে সুনীতিকে মূর্তিমতী দেবী জ্ঞানে পূজা করবে।

সুনীতি। (সকাতরে) আমি পূজা পেতে চাই না গো, আমি দেবী হতে চাই না!

সুকোমল। হ্যাঁ, সুনীতি, আমিও তোমাকে দেবী হতে বলছি না।

পরিমল। আমার বৌদিদি লক্ষ্মীরূপিণী মানবীর মত আমাদের ঘরেই বিরাজ করুন।

সুকোমল। কিন্তু শঙ্কর যে আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই জোর করে তোমার বৌদিদিকে এখান থেকে কেড়ে নিয়ে যেতে চায়!

পরিমল। (দৃপ্ত স্বরে) আমার প্রাণ থাকতে নয়!

সুকোমল। আমিও তাই বলি পরিমল, আমাদের জীবন থাকতে নয়!

পরিমল। আমি পুলিশে খবর দিয়ে এসেছি দাদা! শঙ্কর কি জানে না, তার মতন দুরাত্মাকে বাধা দেবার জন্যে কলকাতায় আছে হাজার হাজার পুলিশের সেপাই?

সুকোমল। সে-কথা আমিও তাকে স্মরণ করিয়ে দিতে ত্রুটি করিনি। শুনে সে হা-হা করে হাসতে লাগল। বিকট সেই হাস্য।

পরিমল। সব দুরাত্মাই বিকট হাস্য করতে পারে দাদা, কিন্তু একবার পুলিশের হাতে পড়লে তাদের বিকট হাসি থেমে গিয়ে জেগে ওঠে কাতর কান্না। এখানে এলে শঙ্করকেও কাঁদতে হবে।

সুকোমল। কিন্তু শঙ্কর কি নিজে আসবে বলে মনে কর?

পরিমল। তবে?

সুকোমল। সে হয়ত পাঠিয়ে দেবে এক ভয়ঙ্করকে!

পরিমল। কে সেই ভয়ঙ্কর? আমি তাকে ভয় করি না!

সুকোমল। আমিও ঠিক জানি না। কিন্তু শঙ্কর বলে, সে হচ্ছে এমন ভয়ঙ্কর, আমরা কেউ তাকে কল্পনাতেও আনতে পারব না!

পরিমল। (সকৌতুকে হাসতে লাগল)

সুকোমল। একি, হঠাৎ অমন করে হাসছ কেন?

পরিমল। (সহাস্যে) তোমার ছেলেমানুষি কথা শুনে আমার হাসি পাচ্ছে দাদা। শঙ্করের ধাপ্পায় তুমিও কি নিজের বুদ্ধি হারিয়ে ফেললে? থানায় যখন গিয়েছিলুম, পুলিশও না হেসে পারেনি। এখন বুঝছি, এই ভয়ঙ্করের কথাটা হাস্যকরই বটে!

সুকোমল। হাস্যকর?

পরিমল। হাস্যকর নয় তো কি? কল্পনায় মানুষ কুম্ভকর্ণের মতন মহাকায় দানব সৃষ্টি করে, আর শঙ্করের এমন কে ভয়ঙ্কর আসবে আমরা যাকে কল্পনাতেও আনতে পারব না? সব বাজে কথা, একেবারে ধাপ্পাবাজি!

সুকোমল। পরিমল, শঙ্করের আস্তানায় গিয়ে আমি কী দেখেছি জানো?

পরিমল। তুমি কী দেখেছ আমি তা কেমন করে জানব?

সুকোমল। শুনলেও তোমরা বিশ্বাস করতে পারবে না!

পরিমল। বিশ্বাস করতে পারব না? তাহলে তুমি কি নিজেই সেই ভয়ঙ্করকে দেখে এসেছ?

সুকোমল। না, ভয়ঙ্কর নয়।

পরিমল। তবে?

সুকোমল। (সভয়ে শিহরিত স্বরে) সে কথা বলতে গিয়ে এখনো আমার বুক কেঁপে-কেঁপে উঠছে!

সুনীতি। ওগো, ওগো, তুমি কী দেখেছ?

সুকোমল। কল্পনার অতীত এক মূর্তিমান বীভৎসতা!

পরিমল। দাদা, দাদা, যা বলবার তাড়াতাড়ি বলে ফেল!

সুকোমল। শঙ্কর আমাকে তার পূজার ঘরে নিয়ে গেল। সে ঘরটাও যেন পৃথিবী-ছাড়া। সেখানে গিয়ে দাঁড়ালেও মনে হয় যেন উৎকট দুঃস্বপ্ন দেখছি। কিন্তু ঘরের সমস্ত বর্ণনা এখন আমি করব না। তবে, এইটুকু শুনে রাখো, তার চার কোণে দাঁড়িয়ে আছে চারটে নর-কঙ্কাল, আর একদিকে মানুষের হাড়ের বেদীর উপর দাঁড় করানো

রয়েছে এক প্রকাণ্ড অতি-কুৎসিত অনার্য দেবতার ভীষণ মূর্তি। সাঁওতালিরা যে রকম সব অপদেবতার মূর্তি পূজা করে, এ-মূর্তিটাও অনেকটা সেইরকম দেখতে। ঘরের মাঝখানে পাতা রয়েছে চারিদিকে মড়ার মুণ্ডু দিয়ে সাজানো ব্যাঘ্রচর্মের উপরে আর-একটা মূর্তি।

পরিমল। সে কিসের মূর্তি?

সুকোমল। মানুষের।

পরিমল। তবে তার কথা বলতে গিয়ে তোমার গলার আওয়াজ এত কাঁপছে কেন?

সুকোমল। (অভিভূত কণ্ঠে) হ্যাঁ, সে মানুষের মূর্তি পরিমল, সে মানুষেরই মূর্তি। কিন্তু সে জীবিত নয়।

পরিমল। শঙ্কর বুঝি কোথা থেকে একটা মড়া জোগাড় করে এনে তোমাকে ভয় দেখাবার চেষ্টা করেছে? কিন্তু দাদা, নিজের হাতে কত মড়া কেটেছ, তবু তুমি ভয় পেয়েছ একটা তুচ্ছ মড়া দেখে? তোমার কথা শুনে আবার আমার হাসি আসছে দাদা!

সুকোমল। (বিকৃত স্বরে) হেসো না পরিমল হেসো না! সেটা মড়া নয়!

পরিমল। (সবিস্ময়ে) তুমি যে কী বলতে চাও দাদা, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না! আমার মনে হচ্ছে তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

সুনীতি। (চিন্তিত স্বরে) ওগো চল, বিছানায় শুয়ে খানিকক্ষণ বিশ্রাম করবে চল।

সুকোমল। (শুষ্ক হাস্য করে) হ্যাঁ, বিশ্রামই করব বটে! না পরিমল, তোমার দাদা এখনো পাগল হয়নি। ব্যাঘ্রাসনের উপরে যে বসে ছিল সে মরা মানুষ নয়। সে চোখ মুদে ছিল, আমার পায়ের শব্দ শুনেই দুই চোখ মেলে তাকিয়ে দেখলে। কী অস্বাভাবিক সেই দৃষ্টি! যেন আমার দেহ ভেদ করে চলে গেল কোন্ দূর দূরান্তরে, কোন্ সীমাহীন শূন্যতার দিকে। শঙ্কর তাকে সম্বোধন করে বললে, 'ঘরের

ভিতরে কে এসেছে দেখতে পাচ্ছ ?' মূর্তির ওষ্ঠাধর নড়ে উঠল, তারপর যেন তার উদরের তলদেশ থেকে গম্ভীর, ভয়াল একটা স্বর বেরিয়ে এল। সে বললে, 'হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছি।' শঙ্কর আমার দিকে ফিরে বললে, 'সুকোমল, তুমি তো চোখেও দেখলে আর কানেও শুনলে, এই লোকটি তাকিয়ে আছে আর কথাও কইছে। এইবারে ওর গায়ে হাত দাও দেখি!' আমি তার গায়ে হাত দিলুম—উঃ! তারপরে পরিমল, তারপরে চমকে উঠে হাতখানা আবার সরিয়ে আনলুম!

পরিমল। (সাগ্রহে) কেন, কেন ?

সুকোমল। তার গা কন্‌কন্ করছে ঠাণ্ডা—দুদিনের বাসি মড়ারও গা অতটা অসম্ভব ঠাণ্ডা হয় না! আমার চমকানি দেখে শঙ্কর হেসে উঠে আবার বললে, 'সুকোমল, তুমি তো ডাক্তার। একবার ঐ লোকটার বক্ষ পরীক্ষা করে দেখ দেখি।' আমি তার কথামত কাজ করলুম। (চিৎকার করে) পরিমল, তার বুক একেবারে স্থির, তার হৃৎপিণ্ডে এতটুকু স্পন্দন নেই! তারপর নাকের কাছে হাত নিয়ে গিয়ে দেখলুম, তার শ্বাস-প্রশ্বাস কিছুই নেই! সে একটা মৃতদেহই বটে, কিন্তু সে কথা কয়, শুনতে পায়, চোখ মেলে তাকায়!

পরিমল। তোমার ভুল হয়নি দাদা ?

সুকোমল। অসম্ভব! আমি সাধারণ লোক নই, আমি ডাক্তার, আজ বারো বছর ধরে ডাক্তারি করছি।

সুনীতি। (আড়ষ্ট স্বরে) তারপর ?

সুকোমল। স্তম্ভিতের মত বসে আছি, শঙ্কর আবার আমাকে ডেকে বললে, 'তুমি আমার শক্তি স্বচক্ষে দেখলে তো ? শুনে রাখো, আমার ভয়ঙ্কর এরও চেয়ে ভয়াবহ! এখন তুমি আমার কথায় রাজি হবে ?' আমি তখনি উঠে দাঁড়িয়ে ক্রুদ্ধ স্বরে তাকে বললুম, 'আমি ভোজবাজি দেখে ভয় পাই না শঙ্কর, তোমার কথায় এ-জীবনে আমি রাজি হব না!' শঙ্কর পাগলের মত চেঁচিয়ে উঠে বললে, 'তাহলে প্রস্তুত থেকো! রাত বারোটার পরেই আমার ভয়ঙ্কর

তোমার বাড়িতে গিয়ে হাজির হবে।' আমি আর সেখানে দাঁড়ালুম না, তাড়াতাড়ি সেই নরকের বাইরে চলে এলুম।

সুনীতি। (সভয়ে) রাত বারোটা! ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখ গো, ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখ!

পরিমল। (সচমকে) রাত বারোটা বাজতে আর দশ মিনিট বাকি।

সুকোমল। (উদ্‌ভ্রান্ত স্বরে) আমি এখন কী করি পরিমল—আমি এখন কী করি সুনীতি? এখনি মনে হচ্ছে আমার সারা বাড়িখানা কী এক অপার্থিব ভাবে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে! পরিমল, পরিমল, তোমার স্ত্রী কোথায়, বৌমা?

পরিমল। কমলা এখন ঘুমিয়ে আছে।

সুনীতি। বারোটা বাজতে আট মিনিট বাকি! (সকাতরে) ওগো, কী হবে গো?

(হঠাৎ ঘরের বাহির থেকে তীক্ষ্ণ একটা আর্তনাদ ভেসে এল)

সুকোমল। (চমকে উঠে) ও যে বৌমার গলা!

পরিমল। (উচ্চস্বরে) …………কমলা—কমলা—কমলা! (দ্রুতপদে প্রস্থান)

—(আবার সেই আর্তনাদ—এবারে আরো তীব্র)

পরিমল। (ঘরের বাহির থেকে) দাদা, দাদা!

সুকোমল। যাই পরিমল, যাই!

(স্ত্রী-কণ্ঠে আবার আর্তনাদ। সুকোমলের বাড়ির তিনতালায় পরিমলের ঘর। কমলা ঘরের এক কোণে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে যেন দেওয়ালের সঙ্গে মিশিয়ে যেতে চাইছে। তার মুখে-চোখে দারুণ ভয়ের ভাব।)

পরিমল। (বেগে ঘরের ভিতরে প্রবেশ করে) কমলা!

কমলা। (ভীতিবিহ্বল বদ্ধ কণ্ঠে) ওগো! (কাঁপতে কাঁপতে মেঝের উপরে বসে পড়ল)

পরিমল। (কমলার কাছে গিয়ে নিজের দুই হাতে তার দুই হাত ধরে) কমলা, তুমি চিৎকার করে কাঁদছিলে কেন? এখনো তুমি এত কাঁপছ কেন?

কমলা। (সেইরকম বদ্ধ কণ্ঠ) সে চলে গেছে?

পরিমল। কে চলে গেছে কমলা?

কমলা। সেই মূর্তিটা?

পরিমল। (সবিস্ময়ে) মূর্তি? মূর্তি আবার কী?

কমলা। পিশাচ!

পরিমল। তুমি এ-সব কী বলছ?

কমলা। রাক্ষস!

পরিমল। মূর্তি—পিশাচ—রাক্ষস, স্বপ্নে কিছু দেখে ভয় পেয়ে তুমি কি প্রলাপ করছ?

কমলা। না গো না, আমি ঘুমোই নি, আমি স্বপ্ন দেখিনি! আমি জেগে জেগেই দেখেছি সেই মূর্তিটাকে!

সুকোমল। (ঘরের বাহিরে কার বিস্মিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল) কে? কে? সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে যাচ্ছ কে তুমি? সাড়া দিচ্ছ না যে? চোর নাকি? দাঁড়াও, দেখছি!

কমলা। ঐ শোন! তোমার দাদাও তাকে দেখতে পেয়েছেন।

পরিমল। কাকে দেখতে পেয়েছেন?

কমলা। সেই পিশাচটাকে!

পরিমল। কে পিশাচ?

কমলা। জানি না। মানুষের মূর্তি, কিন্তু সে মানুষ নয়!

পরিমল। মানুষের মূর্তি, মানুষ ছাড়া আর কী হতে পারে?

সুকোমল। (ঘরের ভিতর প্রবেশ করে) আশ্চর্য!

পরিমল। কী আশ্চর্য দাদা?

সুকোমল। পায়ের শব্দে সিঁড়ি কাঁপিয়ে কে নেমে গেল নিচের দিকে। কিন্তু নিচে গিয়ে কারুকেই দেখতে পেলুম না। অথচ সদর

দরজাটা খোলা রয়েছে। চলেই বা গেল কে, আর দরজাই বা খুললে কে? আমার বেশ মনে আছে বাড়ির ভিতরে ঢুকে নিজের হাতে আমি দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলুম! কে এল? কে গেল? কে দরজা খুললে?

কমলা। সেই মূর্তি! আমি তাকে দেখেছি!

সুকোমল। তুমি কাকে দেখেছ বৌমা?

কমলা। একটা অমানুষের মূর্তিকে! আমি বিছানায় শুয়ে ছিলুম, হঠাৎ ঘরের ভিতরটা ভরে গেল পচা মাংসের গন্ধে। অবাক হয়ে মুখ তুলে দেখি, আমার শিয়রের কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে ভীষণ একটা মূর্তি! আমার মুখের পানে স্থির চোখে সে তাকিয়ে ছিল, আমি চিৎকার করে উঠতেই ঘরের ভিতর থেকে আবার বেরিয়ে গেল।

(বাইরে রাস্তা থেকে কে উচ্চস্বরে বলে উঠল, 'এই সেপাই! পাক্‌ড়ো উস্‌কো!')

পরিমল। রাস্তায় আবার কী কাণ্ড হচ্ছে? (ছুটে জানলার কাছে গিয়ে) কিছু দেখা যায় না, ঘুটঘুটে অন্ধকার। কেবল শোনা যাচ্ছে ছুটোছুটির শব্দ।

(রাস্তা থেকে কণ্ঠস্বর ভেসে এল—'এটা কি সুকোমলবাবুর বাড়ি?')

সুকোমল। (চমকে উঠে) কে ডাকে?

পরিমল। বোধহয় অবনীবাবু এসেছেন।

সুকোমল। অবনীবাবু কে?

পরিমল। থানার ইন্সপেক্টার। চল আমরা নিচে নেমে যাই।

সুকোমল। হ্যাঁ, চল চল! বাড়ির ভিতরে থাকতে আমার ভয় করছে!

(রাস্তা। সুকোমলের বাড়ির সম্মুখভাগ। ইন্সপেক্টার অবনীবাবু কয়েকজন পাহারাওয়ালার সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছেন। সুকোমল ও পরিমল বাড়ির ভিতর থেকে বেরিয়ে পথের উপরে এসে দাঁড়াল।)

অবনী। (টর্চের আলো জ্বেলে) এই যে পরিমলবাবু! আপনার সঙ্গে উনি কে?

পরিমল। আমার দাদা।

অবনী। এইমাত্র আপনাদের বাড়ির ভিতর থেকে বেরিয়ে গেল কে?

পরিমল। জানি না।

অবনী। জানেন না?

পরিমল। না, আমি কারুকে দেখিনি। আপনি যাকে দেখেছেন, সে পুরুষ না স্ত্রীলোক?

অবনী। পুরুষ।

পরিমল। আমাদের বাড়িতে আমরা দুজন ছাড়া আর কোন পুরুষ নেই।

অবনী। কিন্তু আমি যে তাকে স্বচক্ষে দেখেছি! আমি—

সুকোমল। (সভয়ে) ইন্সপেক্টারবাবু, একটা দুর্গন্ধ পাচ্ছেন?

অবনী। পাচ্ছি।

সুকোমল। পচা মড়ার দুর্গন্ধ।

অবনী। ঠিক বলেছেন! এতক্ষণ ও-কথাটা আমার মনে হয়নি। কিন্তু এ কিসের দুর্গন্ধ?

সুকোমল। আমার বোধহয়, যে গেল তার গায়ের গন্ধ।

অবনী। কী বলছেন! জ্যান্ত মানুষের গায়ে মড়ার দুর্গন্ধ?

সুকোমল। ঠিক তাই।

অবনী। কী করে জানলেন আপনি?

সুকোমল। অনুমান করছি।

অবনী। এমন অদ্ভুত অনুমানের কারণ?

সুকোমল। বোধহয় এইমাত্র এখানে যার আবির্ভাব হয়েছিল, খানিক আগে তাকেই আমি দেখেছি শঙ্কর উপাধ্যায়ের বাড়িতে।

অবনী। কে সে?

সুকোমল। (শিউরে) জ্যান্ত মড়া!

অবনী। কী, কী বললেন?

সুকোমল। জীবন্ত মৃতদেহ।

অবনী। পরিমলবাবু, আপনার দাদার মাথা খারাপ নয় তো?

সুকোমল। (শুকনো হাসি হেসে) আপনিও সেই সন্দেহ করছেন? না, আমার মাথা এখনো খারাপ হয়নি ইন্সপেক্টারবাবু, তবে মাথা খারাপ হতে আর বেশিক্ষণ লাগবে না বোধহয়। হ্যাঁ, যা বলছি, সত্য কথা! শঙ্কর উপাধ্যায়ের বাড়িতে গিয়ে আমি একটা মৃতদেহ দেখেছি, কিন্তু জীবন্ত মৃতদেহ!

অবনী। আপনার কথার কোন মানে হয় না। যা জীবন্ত, তাকে মৃতদেহ বলা চলে না।

সুকোমল। তা চলে না। তবু ঐ কথাই আমি বলতে চাই। আমার বিশ্বাস, আপনিও আজ তাকেই দেখেছেন।

অবনী। (দৃঢ় স্বরে) না, আমি দেখেছি একজন জীবন্ত মানুষকে।

সুকোমল। তাকে কীরকম দেখতে বলুন দেখি?

অবনী। ঐখানেই একটু মুস্কিল আছে। আমি তার মুখ দেখতে পাইনি—দেখেছি তার পিছন দিকটা। তবে তার হাব-ভাব, চলা-ফেরা আমার কাছে সন্দেহজনক বলে মনে হয়েছিল। তাই তাকে দাঁড়াতে বললুম, কিন্তু সে আমার কথা না শুনে কলে-চলা পুতুলের মত হন্-হন্ করে এগিয়ে চলে গেল। পাহারাওয়ালাদের তাকে ধরে আনতে বললুম, কিন্তু সে ঐ সরু গলিটার ভিতরে ঢুকে পড়ে কোথায় যে মিলিয়ে গেল বলতে পারি না।

সুকোমল। আমার বড়ই সন্দেহ হচ্ছে, আমার বড়ই সন্দেহ হচ্ছে যে শঙ্কর উপাধ্যায় আমাকে ভয় দেখাবার জন্যে সেই মৃতদেহ-টাকেই আমার বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছিল! আর—

অবনী। (বাধা দিয়ে অধীর স্বরে) থামুন মশাই থামুন!

বার-বার একটা বাজে কথা বলে আমাকে ত্যক্ত করবেন না। জ্যান্ত মড়া! যা নয় তাই!

সুকোমল। আপনি যদি বিশ্বাস না করেন, আমি নাচার। শঙ্কর উপাধ্যায়কে আপনি চেনেন না, তাই এই কথা বলছেন।

অবনী। রাখুন আপনার শঙ্কর উপাধ্যায়! দুনিয়ায় আমি অনেক শর্মাকেই ঠাণ্ডা করেছি!

পরিমল। ইন্সপেক্টার মশাই, আপনি আমার দাদার কথা উড়িয়ে দিতে চাইছেন বটে, কিন্তু আমার মনে হয় এই ব্যাপারটার মধ্যে নিশ্চয়ই অলৌকিক কিছু আছে!

অবনী। আমি পুলিশ, অলৌকিক ঘটনা মানি না।

পরিমল। আজ কী হয়েছে জানেন?

অবনী। কী?

পরিমল। আমাদের বাড়ির সদর দরজা যে ভিতর থেকে বন্ধ ছিল, সে-বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। কিন্তু ঐ মূর্তিটা বাহির থেকে আশ্চর্য উপায়ে দরজা খুলে বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করেছিল।

অবনী। এতে আশ্চর্য হবার কী আছে? অনেক কৌশলী চোরও বাহির থেকে দরজা খোলবার উপায় জানে। আপনাদের বাড়িতে চোর এসেছিল, সকলের সাড়া পেয়ে পালিয়ে গিয়েছে।

পরিমল। তারপর শুনুন, আমরা তাকে দেখিনি বটে, কিন্তু আমার স্ত্রী স্বচক্ষে তাকে দেখেছেন। তিনি কী বলেন জানেন?

অবনী। কী বলেন?

পরিমল। তিনি বলেন তাকে দেখতে পিশাচের মত, রাক্ষসের মত! তিনি বলেন, যাকে দেখেছেন তার মানুষের মূর্তি, কিন্তু সে মানুষ নয়।

অবনী। (বিরক্ত স্বরে) রাবিশ! আমি এখন ডিউটিতে আছি। এখানে দাঁড়িয়ে আপনাদের রূপকথা শুনে সময় নষ্ট করতে চাই না। (প্রস্থান করতে উদ্যত হলেন।)

সুকোমল। (কাতর স্বরে) যাবেন না ইন্সপেক্টার মশাই, আমাদের ফেলে চলে যাবেন না।

অবনী। আচ্ছা মুস্কিল তো! আমার কি আর কোন কর্তব্য নেই? এখানে সারারাত দাঁড়িয়ে আমাকে কি পাগলের প্রলাপ শুনতে হবে?

সুকোমল। শঙ্কর উপাধ্যায় বলেছে, আজ রাত বারোটার সময় ঐ জ্যান্ত মড়াটার চেয়েও সাঙ্ঘাতিক কোন ভয়ঙ্করকে আমাদের বাড়িতে পাঠিয়ে দেবে।

অবনী। (হা হা করে হেসে উঠে) জ্যান্ত মড়ার উপরেও আরো কিছু আছে নাকি? তাহলে বোধহয় শঙ্কর উপাধ্যায়ের হুকুমে জড় হিমালয় পর্বত আজ জ্যান্ত হয়ে আপনাদের বাড়ির উপরে এসে ভেঙে পড়বে! কী বলেন? (আবার কৌতুক হাস্যে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন)

পরিমল। (সভয়ে) দাদা, দাদা! চেয়ে দেখ, ঐদিকে চেয়ে দেখ! ঐ গলির ভিতর থেকে সাদা-মতন কি-একটা এদিকে আসছে না?

অবনী। (তাড়াতাড়ি ফিরে দাঁড়িয়ে) হ্যাঁ, কেউ আসছে বটে। মাঝে মাঝে টর্চ জ্বেলে পথ দেখছে। সে লোকটাও ঐ গলির ভিতরেই ঢুকে গিয়েছিল, কিন্তু তার হাতে টর্চ ছিল না। এ অন্য কোন লোক।

[সকলে সেইদিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল, মূর্তিটা ধীরে ধীরে তাদের কাছে এসে দাঁড়াল।]

অবনী। (আগন্তুকের দিকে টর্চের আলো নিক্ষেপ করে) কে আপনি?

আগন্তুক। (সহাস্যে) পথিক।

অবনী। এত রাত্রে কোথা থেকে আসছেন?

আগন্তুক। বিয়ে-বাড়ি থেকে নিমন্ত্রণ খেয়ে ফিরছি।

অবনী। আপনার নাম কী ? কোথায় থাকেন ?

আগন্তুক। আমার নাম হরিহর চৌধুরী। থাকি জোড়াসাঁকোয়।

অবনী। দেখলুম আপনি ঐ গলির ভিতর থেকে বাইরে এলেন। ওখানে আর কারুর সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছিল ?

হরিহর। (রহস্যময় হাসি হেসে) হয়েছিল।

অবনী। তার মুখ দেখেছেন ? আবার তাকে দেখলে চিনতে পারবেন ?

হরিহর। (আবার সেইরকম হাসি হেসে) তার মুখ দেখেছি। পায়ের শব্দ শুনে টর্চের আলো জ্বেলেই দেখলুম, গলির ভিতরে পচা মড়ার গন্ধ ছড়িয়ে এগিয়ে আসছে একটা অদ্ভুত মূর্তি।

অবনী। অদ্ভুত মূর্তি ?

হরিহর। হ্যাঁ। অদ্ভুত মূর্তি, কারণ সে হচ্ছে একটা চলন্ত মৃতদেহ।

অবনী। (ব্যঙ্গের হাসি হেসে) এতক্ষণ শুনছিলুম জীবন্ত মৃতদেহ, এখন আবার শুনছি চলন্ত মৃতদেহের কথা। আজ কি সকলেই ক্ষেপে গিয়েছে !

হরিহর। আপনাকে পুলিশ কর্মচারী বলে মনে হচ্ছে। পৃথিবীর অপরাধীদের নিয়েই আপনাদের কারবার, কিন্তু এই সাধারণ পৃথিবীর ভিতরেই যেসব অসাধারণ রহস্য আছে, আপনারা তার কতটুকু খবর রাখেন ?

অবনী। আপনি দেখছি সুকোমলবাবুর চেয়েও আর-এক পর্দা উপরে উঠে কথা কইছেন ! সাধারণ পৃথিবীর অসাধারণ রহস্যের কথা আপনি আমার চেয়ে ভাল করে জানলেন কেমন করে ?

হরিহর। প্রেততত্ত্ববিদ বলে আমার কিঞ্চিৎ খ্যাতি আছে।

সুকোমল। (তাড়াতাড়ি এগিয়ে) আপনিই কি সেই বিখ্যাত প্রেততত্ত্ববিদ হরিহরবাবু ?

অবনী। (হাস্য করে) তাহলে আপনার নাম আমারও

অপরিচিত নয়। শুনেছি আপনি ইহলোকে বসেই পরলোকের বাসিন্দাদের সঙ্গে আলাপ করতে পারেন। কিন্তু আমি মশাই ও-সব কথায় একটুও বিশ্বাস করি না।

হরিহর। আপনি বিশ্বাস না করলেও ইহলোকের বা পরলোকের কোনই ইষ্ট বা অনিষ্ট হবে না।

সুকোমল। (ব্যস্তভাবে) হরিহরবাবু, হরিহরবাবু! আপনার কাছে আমি গোটাকয়েক কথা নিবেদন করতে পারি কি ?

হরিহর। অনায়াসেই।

সুকোমল। তাহলে দয়া করে এইদিকে একটু এগিয়ে আসুন। [হরিহরকে নিয়ে সুকোমল খানিকটা তফাতে গিয়ে মৃদুস্বরে কি বলতে লাগল, শোনা গেল না।]

অবনী। পরিমলবাবু, আপনাদের এখানে আর কিছুক্ষণ থাকলে আমিও ক্ষেপে যাব বলে মনে হচ্ছে! কই, এখনো তো কোন ভয়ঙ্করেরই আবির্ভাব হল না! ও-সব বাজে ভয় নিয়ে মাথা ঘামাবেন না, আমি এখন চললুম।

পরিমল। ইন্সপেক্টার মশাই, দয়া করে আর-একটু অপেক্ষা করুন।

অবনী। আমি হচ্ছি পুলিশের লোক, রোজা নই। ভৌতিক কাণ্ড-কারখানার ভিতরে আমি থাকতে ইচ্ছা করি না।

পরিমল। আপনাদের পেয়ে আমরা অকূলে কূল পেয়েছি! আর মিনিট কয়েকের জন্যে এখানে অপেক্ষা করলে বোধহয় আপনার কাজের কোনই ক্ষতি হবে না।

অবনী। (নাচারভাবে) আপনারা জ্বালালেন দেখছি। (মিনিট পাঁচেক কেটে গেল। হরিহর ও সুকোমল আবার এদিকে অগ্রসর হয়ে এল।)

হরিহর। সুকোমলবাবু, আপনার ব্যাপারটা বিশেষ জটিল বলে বোধ হচ্ছে না। যদিও এ-রকম ঘটনার মধ্যে এর আগে আমি নিজে কখনো এসে পড়িনি, তাহলেও আমার গুরুদেব সত্যশিবসুন্দর

স্বামীজীর কাছ থেকে শুনেছি, এমন-সব ঘটনা ঘটাও কিছুই অসম্ভব নয়। বামাচারীরা নিম্নশ্রেণীর সাধক বটে, কিন্তু তারা এমন সব অদ্ভুত শক্তি অর্জন করে যা আমরা অনায়াসেই অপার্থিব বলে মনে করতে পারি। এমনকি, একান্তভাবে ধ্যানের দ্বারা আর মন্ত্রগুণে তারা অতিকায় দানব পর্যন্ত সৃষ্টি করতে পারে। আমার বিশ্বাস, আপনাদের ঐ শঙ্কর উপাধ্যায় আপনাকে ভয় দেখাবার জন্যে হয়ত ঐ-রকম কোন একটা মূর্তি এখানে প্রেরণ করতে চায়। সত্যি-সত্যিই সে মূর্তি হচ্ছে অসীম শক্তিশালী আর কল্পনাতীতরূপে ভয়ঙ্কর, যার বিরুদ্ধে দাঁড়ালে আমাদের এই ইন্সপেক্টার মশাইয়ের একাধিক রিভলভার আর পাহারাওয়ালাদের শতাধিক রুলের গুঁতো পর্যন্ত একেবারেই ব্যর্থ হয়ে যাবে।

অবনী। মশাই, আপনি দেখছি সকলের উপরে টেক্কা মারলেন! আপনার মতন উন্মত্ত মানুষ পৃথিবীর সবচেয়ে বড় পাগলা গারদে গেলেও আবিষ্কার করা অসম্ভব।

হরিহর। (সহাস্যে ও বিনীতভাবে) আপনার এই অভিনন্দন আমি সাদরে গ্রহণ করলুম। কিন্তু আমার একটি অনুরোধ আছে। রাখবেন কি?

অবনী। কী অনুরোধ?

হরিহর। দয়া করে যদি এখানে আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেন, তাহলে কল্পনাতীত অলৌকিক ঘটনাও যে এই সাধারণ পৃথিবীতে সম্ভবপর হয়, সেইটেই আপনার চোখের সামনে প্রমাণিত করে দেব।

অবনী। কথায় বলে—'পড়েছি মোগলের হাতে খানা খেতে হবে সাথে।' বেশ, আপনারা ভৌতিক ধাপ্পাবাজির আয়োজন যখন করেছেন, তখন তার শেষ পর্যন্তই দেখা যাক। 'ডুবেছি না ডুবতে আছি, দেখা যাক পাতাল কত দূর!'

হরিহর। সুকোমলবাবু, ইন্সপেক্টার মশাই এখনো অবিশ্বাসী।

সুতরাং ওঁর কথা নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই। আসুন, এখন আমরা নিজেদের কর্তব্য পালন করি।

সুকোমল। আমার যে কী কর্তব্য আমি তা নিজেই বুঝতে পারছি না।

হরিহর। আমার অনুরোধ রক্ষা করলেই আপনাদের কর্তব্য পালন করা হবে।

সুকোমল। আদেশ করুন।

হরিহর। আদেশ নয়, অনুরোধ।

সুকোমল। বলুন।

হরিহর। আমার অনুরোধ হচ্ছে, আপনারা সকলে বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করুন।

অবনী। (ব্যঙ্গসূচক ভ্রূভঙ্গী করে) তারপর ?

হরিহর। তারপর ? তারপর আপনাদের আর বিশেষ কিছুই করতে হবে না, কারণ তারপর আপনারা অধিকার করবেন কেবল দর্শকের আসন।

অবনী। আর আপনি ? তারপর অভিনেতা হবেন কি আপনি ?

হরিহর। মোটেই নয়। এই বিচিত্র নাটকীয় দৃশ্যাভিনয়ের জন্যে আমি কেবল রঙ্গমঞ্চ প্রস্তুত করে রাখতে চাই।

অবনী। তার মানে ?

হরিহর। মানে আপনি কিছুই বুঝবেন না, কারণ আপনি এখনো পর্যন্ত অবিশ্বাসী।

অবনী। (ক্রুদ্ধ স্বরে) আমি বিশ্বাসী কি অবিশ্বাসী তা নিয়ে বাজে কথা খরচ করবেন না! আমি জানতে চাই, আপনি এখানে কোন্ ভূমিকায় অভিনয় করবেন ?

হরিহর। আমি ? আমি আগে এই বাড়িখানার চারিদিকে মন্ত্রঃপূত রেখা টেনে দিতে চাই।

অবনী। কেন ?

হরিহর। ভয়াবহ অমঙ্গলের কবল থেকে আপনাদের রক্ষা করার জন্যে।

অবনী। (ঠোঁট বেঁকিয়ে হেসে) তাই নাকি ?

হরিহর। (তপ্ত কণ্ঠে) হ্যাঁ, তাই! আপনার ঐ অজ্ঞতা আর মূর্খতা দিয়ে বারবার আমাকে বাধা দেবার চেষ্টা করবেন না। আমি বুঝতে পারছি, আর সময় নেই! মনে মনে আমি শুনতে পাচ্ছি, এমন কোন ভয়ঙ্কর পৃথিবীর মাটির উপর তার অপার্থিব মূর্তি নিয়ে এইদিকে ধেয়ে আসছে, যার কবলে পড়লে আপনাদের তুচ্ছ অস্তিত্ব এখনি বিলুপ্ত হয়ে যাবে। (আদেশের স্বরে) যান, যদি প্রাণে বাঁচতে চান, অবিলম্বে ঐ বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করুন!

[অকস্মাৎ হরিহরের মূর্তির এবং তাঁর কণ্ঠস্বরের অদ্ভুত পরিবর্তন হল। তাঁর গাম্ভীর্য ও সুদৃঢ় কণ্ঠস্বর শুনে সকলেরই মন হয়ে উঠল সচকিত। সকলে, এমনকি ইন্সপেক্টার অবনী পর্যন্ত আর কোন কথা বলতে সাহস না পেয়ে মাথা নত করে বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করলে।]

৪

[সুকোমলের বাড়ির দোতলার বারান্দা। সেখানে দাঁড়িয়ে আছে সুকোমল, পরিমল ও অবনীবাবুর সঙ্গে হরিহর। তাদের সকলেরই দৃষ্টি নিচেকার রাস্তার দিকে।]

অবনী। অন্ধকারের ভিতরে যেন দুটো চলন্ত মূর্তি দেখা যাচ্ছে না ?

হরিহর। হ্যাঁ। মূর্তিদুটো এইবারে এই বাড়ির কাছে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল।

[অবনী সেইদিকে টর্চের আলোক নিক্ষেপ করলে।]

সুকোমল। (সভয়ে আর্তনাদ করে উঠল)

অবনী। অমন করে উঠলেন কেন স্থকোমলবাবু ?

স্থকোমল। (অভিভূত স্বরে) ও যে সেই !

অবনী। কে ?

স্থকোমল। সেই জীবন্ত মৃতদেহটা !

হরিহর। অমন আড়ষ্টভাবে তাকিয়ে কী দেখছেন ইন্সপেক্টার মশাই ? আমিও টর্চ জ্বালি, ডবল টর্চের আলোয় আপনি আরো ভাল করে ঐ মূর্তিটাকে দেখুন। ও চলছে আর নড়ছে বটে, কিন্তু ওকে কি জ্যান্ত মানুষ বলে মনে হয় ?

অবনী। (খানিকক্ষণ স্তম্ভিতের মতন থেকে) এ কী দেখছি !

স্থকোমল। (উত্তেজিত কণ্ঠে) ঐ মূর্তিটা এবারে একলা আসেনি, ওর সঙ্গে এসেছে শঙ্কর উপাধ্যায় নিজেও !

শঙ্কর। (হা হা স্বরে উচ্চহাস্য করে) হ্যাঁ স্থকোমল, এবার আমিও তোমার বাড়িতে বেড়াতে এসেছি !

অবনী। কে তুমি ? কী চাও এখানে ?

শঙ্কর। (আবার বিকট হাস্য করে) আমি যা চাই স্থকোমল তা জানে !

অবনী। আমি এখনি তোমাকে আর তোমার সঙ্গীকে গ্রেপ্তার করব !

শঙ্কর। তাই নাকি ? হা হা হা হা হা ! তুচ্ছ জীব, আমাকে গ্রেপ্তার করবে তুমি ?

অবনী। (ক্রোধে চিৎকার করে পাহারাওয়ালাদের উদ্দেশে) সেপাই ! এই সেপাই ! তোমরা—

হরিহর। (বাধা দিয়ে) শান্ত হোন। পাহারাওয়ালাদের ডাকছেন কেন ?

অবনী। ঐ ছুটো বদমাইসকে ধরে আনবে বলে। মারের চোটে ওদের হাড় গুঁড়ো করে দেব !

হরিহর। এখন এ-বাড়ি থেকে জনপ্রাণীর রাস্তায় বেরুনো উচিত নয়।

অবনী। আপনার ও-কথা আমি মানব না। আগে ওদের গ্রেপ্তার করি, তার পর অন্য কথা।

হরিহর। কিন্তু কাকে আপনি গ্রেপ্তার করবেন? চেয়ে দেখুন, ওরা আবার অন্ধকার-সমুদ্রে তলিয়ে গিয়েছে।

অবনী। কিন্তু তলিয়ে ওরা যাবে কোথায়? এখনো ওরা বেশি দূরে যেতে পারেনি। (চিৎকার করে) সেপাই! সেপাই!

হরিহর। চুপ করুন! আরো দূরে তাকিয়ে দেখুন।

অবনী। (তীক্ষ্ণ নেত্রে দেখবার চেষ্টা করে) কই, কী দেখব? দেখছি তো খালি অন্ধকার!

হরিহর। অন্ধকারের ভিতরে অন্ধকারের চেয়েও কালো আর-একটা বিরাট ছায়া দেখছেন না? ভাল করে দেখুন, ছায়াটা এইদিকেই এগিয়ে আসছে!

অবনী। (আবার দেখবার চেষ্টা করে) হ্যাঁ,—আশ্চর্যরকম প্রকাণ্ড একটা ছায়া! প্রায় দোতালা বাড়ির সমান উঁচু, আর চওড়াতেও বোধহয় আট-দশ হাতের কম হবে না! কী ওটা?

হরিহর। ভয়ঙ্কর।

অবনী। সে আবার কী?

হরিহর। ঐ ছায়াটাই হচ্ছে শঙ্কর উপাধ্যায়ের ভয়ঙ্কর। কিন্তু ওটা ছায়া নয়, রীতিমত কায়া। ও আরো কাছে এগিয়ে এসেছে। ওর মাটি-কাঁপানো বিপুল পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছেন তো?

সুকোমল। (সভয়ে) ও কেন এগিয়ে আসছে—ও কেন এদিকে এগিয়ে আসছে?

হরিহর। আপনারই জন্যে।

অবনী। (টর্চ জ্বেলে বিস্মিত কণ্ঠে) কই, আর কিছুই দেখতে পাচ্ছি না তো?

হরিহর। (মৃদু হাস্য করে) আলো জ্বেলে আপনি কাকে দেখতে চান, ইন্সপেক্টার মশাই ? অন্ধকারের ভিতরে গিয়ে পড়লে আলো নিজেই ফুটে ওঠে বটে, কিন্তু আলো জ্বেলে কেউ কি কখনো অন্ধকারকে খুঁজে পেয়েছে ? যে আসছে সে হচ্ছে অন্ধকারের সন্তান, নিরেট অন্ধকার দিয়ে ওর সর্বশরীর গড়া। আলো নেবালেই আবার ওকে দেখতে পাবেন।

অবনী। (আলো নিবিয়ে) কিন্তু এই যে বললেন ওটা ছায়া নয়, কায়া ?

হরিহর। হ্যাঁ, কায়া বটে, কিন্তু অন্ধকারেরই কায়া। ওটা কায়া বলেই ওর ভয়াবহ পদশব্দ আমরা শুনতে পাচ্ছি।

অবনী। (হতভম্বের নত) আপনার কোন কথার অর্থ ই আমি বুঝতে পারছি না, সবই যেন অসম্ভব আজগুবি কথা !

হরিহর। এখন অর্থ বোঝবার চেষ্টা করবেন না, অর্থ বোঝাবার সময়ও আমার নেই। কিন্তু আবার চেয়ে দেখুন, রাস্তা থেকে কত উঁচুতে ও-ছুটো কী দেখছেন ?

অবনী। ক্রিকেট বলের মত বড় ছুটো আগুনের গোলা। ও ছুটো আবার কী ?

হরিহর। ঐ কৃষ্ণ অপচ্ছায়ার ছুটো অগ্নিময় চক্ষু। দেখছেন ঐ চোখছুটো ? ওর ভীষণ আত্মার সমস্ত বীভৎসতা ফুটে উঠেছে ঐ ছুটো চক্ষুর ভিতর দিয়ে। পৃথিবীর যত পাপ আর হত্যা আর হিংসার ভাব যেন ঐ ছুটো চক্ষুর ভিতরেই গিয়ে বাসা বেঁধেছে। দেখুন, ঐ ক্ষুধিত চোখছুটো তাকিয়ে আছে সুকোমলবাবুর দিকেই।

সুকোমল। উঃ ! (কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়ল)

হরিহর। ভয় নেই সুকোমলবাবু, ভয় নেই ! ঐ অন্ধকারের জীবদের সমস্ত রহস্যই আছে আমার নখদর্পণে, আমি যতক্ষণ এখানে আছি আপনাদের কারুর কোনই ভয় নেই।

শঙ্কর। (দৃষ্টির অন্তরালে থেকে প্রচণ্ড স্বরে অট্টহাস্য করে)

ভয় নেই? ভয়ঙ্কর যখন মূর্তি ধারণ করেছে, তখন কে বলে ভয় নেই?……ওরে ভয়ঙ্কর! ওরে বিশ্বগ্রাসী মৃত্যুর শরীরী প্রকাশ। ওরে চির-অতৃপ্ত ক্ষুধার নিজস্ব মূর্তি! জেগে ওঠ্ তুই, আরো ভাল করে জেগে ওঠ্! পৃথিবীর বুক থেঁৎলে মূর্তিমান ঝড়ের মত ধেয়ে যা তুই এই অভিশপ্ত বাড়ির দিকে, ধেয়ে যা! এক পদাঘাতে এখানকার যা-কিছু সব করে দে চূর্ণবিচূর্ণ! আমি নিজে তোর মূর্তি গঠন করেছি—আমি তোর পিতা, আমি তোর স্রষ্টা! সমস্ত বিলুপ্ত করে দিয়ে তোর ক্ষুধা নিবৃত্তি কর—এই হচ্ছে আমার আদেশ!

[অন্ধকারে শোনা গেল কেবল দ্রুত পদের প্রচণ্ড শব্দ এবং অন্ধকার-পরিপূর্ণ শূন্যের মধ্যে বৃহৎ ছুটো অগ্নিময় নেত্রের চারিদিকে দাউ-দাউ করে জ্বলে উঠল যেন কতকগুলো বিদ্যুৎ-শিখা। একমাত্র হরিহর ছাড়া আর সকলেই দারুণ আতঙ্কে আর্তনাদ করে উঠল।… আচম্বিতে পদশব্দ হল নীরব, নিবে গেল ছুটো জ্বলন্ত চক্ষু]

হরিহর। (সানন্দে) আমার মন্ত্রঃপূত রেখা সফল হয়েছে! আমার রেখা ব্যর্থ করে দিয়েছে এই দীপ্ত চক্ষুর ছায়াময় বিভীষিকার মারাত্মক আক্রমণকে! অন্ধকারের অভিশপ্ত আত্মা আবার মিলিয়ে যাবার চেষ্টা করছে অন্ধকারের মধ্যে। কিন্তু মিলিয়ে যাবার আগে ওকে আমারই আদেশ পালন করতে হবে।……(চিৎকার করে) ওরে নিষ্ঠুর হত্যার শরীরী কালিমা! ওরে চির-অতৃপ্ত হিংস্র ক্ষুধার মূর্তি! বিলুপ্ত হবার আগে পরিতৃপ্ত কর তোর ঐ বীভৎস ক্ষুধাকে! ধেয়ে যা তোর স্রষ্টার দিকে—যে আজ তোর ক্ষুধাকে জাগ্রত করেও তৃপ্ত করতে পারলে না! তোর ক্ষুধাগ্নির ইন্ধন রূপে গ্রহণ কর সেই দুরাত্মাকেই!

[আবার মাটি-কাঁপানো দ্রুত পদশব্দ শোনা গেল। কিন্তু শব্দ এবারে এগিয়ে আসছে না, অন্যদিকে চলে যাচ্ছে। অন্ধকার ফুঁড়ে দাউ-দাউ শিখা নাচিয়ে জেগে উঠল আবার ছুটো প্রদীপ্ত ও ভয়াল চক্ষু]

শঙ্কর। (দৃষ্টির অন্তরালে থেকে গগনভেদী আর্তনাদ করে) রক্ষা কর! ক্ষমা কর! মুক্তি দাও! ওরে, আমি তোর স্রষ্টা। ওরে, আমাকে হত্যা—(আর কিছু শোনা গেল না)

হরিহর। (প্রশান্ত কণ্ঠে) শান্তি, শান্তি, শান্তি! হত্যাকে যে মূর্তিদান করে, হত্যার পায়ে আত্মবলি দিতে হয় তাকেই! সুকোমল-বাবু, উঠে দাঁড়ান, আর আপনার কোন ভয় নেই। পৃথিবী থেকে একটা মহা পাপ বিদায় হয়েছে।

অবনী। (বিহ্বলের মত) আমি কিছুই বুঝতে পারছি না! আমি জেগে আছি, না দুঃস্বপ্নের জগতে বাস করছি?

হরিহর। বলতে পারি না। এই দুনিয়ায় স্বপ্নই হয় সত্য, কিংবা সত্য পরিণত হয় স্বপ্নে, এ কথা ঠিক করে বলা বড় কঠিন। আজকে যা দেখলেন আর শুনলেন, আপনারা এখন তাই নিয়েই আলোচনা করুন, আমি এখন বিদায় হলুম। নমস্কার।

৫

[রাস্তা। অবনী, সুকোমল ও পরিমল এবং পাহারাওয়ালারা। সকলেরই হাতে জ্বলন্ত টর্চ। এদিকে-ওদিকে তাকাতে তাকাতে তারা অগ্রসর হচ্ছে।]

সুকোমল। যদিও এখন আর কোনদিকে কারুর সাড়া নেই, তবু এখনো আমার কেমন ভয় করছে!

অবনী। পুলিশে চাকরি করি, আমার তো ভয় করলে চলবে না! যারা ভয়াল, তাদের নিয়েই আমাদের কাজ।

পরিমল। কিন্তু কী দেখতে আমরা এখানে এসেছি?

অবনী। জানি না। আজ যা স্বচক্ষে দেখেছি তাও সত্য-সত্যই দেখেছি বলেও বিশ্বাস হচ্ছে না। জীবন্ত মৃতদেহ, ছায়াময় বিরাট কায়া পদভারে মাটি কাঁপিয়ে চলা-ফেরা করে, মন্ত্রঃপূত রেখা টেনে

তাকে আবার বাধা দেওয়া যায়! আমরা যেন আরব্য-রজনীর ভিতরে গিয়ে একটি রাত্রি যাপন করছি! এ-সব কথা যদি আমার রিপোর্টে লিখি, তাহলে আমাদের বড়, মেজ, ছোট সাহেব তো হেসেই খুন হবে! হয়ত বাধ্য হয়ে আমাকে পেনশন পাবার আগেই কাজ থেকে অবসর নিতে হবে।

পরিমল। তাহলে আপনার রিপোর্টে এ-সব উল্লেখ না করাই ভাল। আজকের রাতের কোন কথাই অন্য কারুকে বলবার দরকার নেই।

অবনী। তাই বা কেমন করে হয়? বিকট একটা আর্তনাদ শুনেছি—ঠিক যেন মৃত্যু-যন্ত্রণার আর্তনাদ! খুব সম্ভব আজ এখানে একটা নরহত্যা হয়েছে। আমি তার তদন্ত করতে বাধ্য। কে মারলে কাকে? কেন মারলে? কেমন করে মারলে? এ-সব প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে আমাকেই। আমাদের সঙ্গে হরিহরবাবুও থাকলে ভাল হত, কিন্তু ঘটনাস্থলে হঠাৎ আবির্ভূত হয়ে আবার তিনি হঠাৎ অন্তর্হিত হয়ে গেছেন।

পরিমল। আশ্চর্য মানুষ! যেন ঈশ্বর-প্রেরিত! তিনি না থাকলে আমাদের অবস্থা কী যে হত, কে জানে?

সুকোমল। (সচমকে) খানিক দূরে কে যেন দাঁড়িয়ে রয়েছে না?

অবনী। হ্যাঁ, একটা মূর্তি।

সুকোমল। (সভয়ে) তবে কি—

অবনী। লোকটা কে দেখতে হচ্ছে।

সুকোমল। না, না, আর এগিয়ে যাবেন না!

অবনী। কেন?

সুকোমল। ও যদি শঙ্কর উপাধ্যায় হয়?

অবনী। তাহলেও আমাকে এগিয়ে যেতে হবে। (আরো খানিক অগ্রসর হয়ে) একি, হরিহরবাবু?

হরিহর। আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি যে হরিহর, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই।

অবনী। আপনি এখনো এখানে?

হরিহর। (সহাস্যে) বোধহয় একই কারণে আমরা সকলেই এখানে এসেছি।

অবনী। আমরা এসেছি, কে এখানে আর্তনাদ করলে তাই জানবার জন্যে।

হরিহর। আমারও ঠিক ঐ উদ্দেশ্য।

অবনী। কিছু জানতে পেরেছেন?

হরিহর। পেরেছি।

অবনী। কী জানতে পেরেছেন?

হরিহর। আরো খানিকটা এগিয়ে এলেই দেখবেন, এখানে দুটো লাশ পড়ে আছে।

(সকলে তাড়াতাড়ি সেইদিকে ছুটে গেল)

সুকোমল। (সবিস্ময়ে) অ্যাঁ, এ যে শঙ্কর উপাধ্যায়ের দেহ! উঃ, ওর মুখের কী ভয়ঙ্কর ভাব!

হরিহর। তারও চেয়ে ভয়ঙ্কর কিছু দেখতে পাচ্ছেন না?

সুকোমল। কী?

হরিহর। (গম্ভীর স্বরে) আমি ওর দেহটা ভাল করেই পরীক্ষা করেছি। ও কেমন করে মরেছে জানি না, কারণ দেহের কোথাও কোন আঘাতের এতটুকু চিহ্ন নেই। কিন্তু ওর দেহের ভিতরে যে এতটুকু রক্তও নেই, পরীক্ষা করলে আপনারাও তা জানতে পারবেন। কে যেন কোন রহস্যজনক উপায়ে ওর দেহ থেকে সমস্ত রক্ত একেবারে শোষণ করে নিয়েছে।

অবনী। এমন কথাও এই প্রথম শুনলুম!

হরিহর। তারপর ঐদিকে তাকিয়ে দেখুন।

অবনী। আর-একটা লাশ!

হরিহর। ও হচ্ছে সেই মূর্তি—মৃত্যুর পরেও যে জীবন্ত দেহ নিয়ে পৃথিবীর উপরে বিচরণ করত।

অবনী। মড়ার মৃত্যু!

হরিহর। অবনীবাবু, ও আগেও ছিল মড়া, এখনো আছে মড়া। ওরও দেহ পরীক্ষা করলে বুঝবেন, ওটা তাজা নয়, অনেক দিন আগেই ওর মৃত্যু হয়েছে।

সুকোমল। কিন্তু ওর মধ্যেও যে জীবনী-শক্তি ছিল, সেটাও আমরা সকলে স্বচক্ষে দেখেছি।

হরিহর। (মাথা নেড়ে) সে জীবনী-শক্তি ওর নিজের নয়।

সুকোমল। তবে?

হরিহর। শঙ্কর উপাধ্যায় মন্ত্রগুণে এই মৃতদেহের মধ্যে সঞ্চারিত করেছিল নিজের জীবনী-শক্তির অংশ। মড়ার উপরে এখানে কেউ খাঁড়ার ঘা মারেনি, শঙ্করের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই এই মৃতদেহের ভিতর থেকে তার জীবনী-শক্তি অদৃশ্য হয়েছে।

অবনী। আর সেই ভয়ঙ্করের বিরাট ছায়া-দেহটা?

হরিহর। (হাত তুলে চারিদিকের অন্ধকারকে দেখিয়ে) নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে বাস করে যত পাপ, যত অমঙ্গল, যত ভয়ঙ্কর। মহা পাপী শঙ্করের অপবিত্র কল্পনা অন্ধকারের ভিতর থেকে মূর্ত করে তুলেছিল যে নৃশংস অমঙ্গলকে, স্রষ্টাকে হত্যা করেও সে কি আর নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারে? স্রষ্টার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই মানস-পুত্রেরও মৃত্যু হয়েছে। অন্ধকারের আত্মজ আবার প্রবেশ করেছে অন্ধকারের অন্তঃপুরে।

যবনিকা

কবিতা

যখন আমি ছোট্ট ছিলাম

যখন আমি ছোট্ট ছিলাম, কাঠবিড়ালির দল
লুকোচুরি খেলত কাছে এসে,
শালিখ-টিয়ার সঙ্গে হত চড়ুইরা চঞ্চল,
বলত কত গল্প ভালোবেসে।
কোকিল-শ্যামাও থাকতনাকো দূরে,
গান শোনাতো সবুজ পাতার সুরে,
আমার শিশু-চোখ হত ভাই আনন্দে উজ্জ্বল,
উড়ত তারা নীল গগনের দেশে—
যখন আমি ছোট্ট ছিলাম, প্রজাপতি খেলত কাছে এসে।

যখন আমি ছোট্ট ছিলাম, ফুলবাগানে গেলে
আমায় পেলে হাসত ফুলের কুঁড়ি,
আসত কত পরীর মেয়ে সঙ্গে পরীর ছেলে,
ছুটত পরাগ-রেণু ছুঁড়ি-ছুঁড়ি।
সাত-ভাই-চাঁপার মিষ্টি পারুল বোনটি,
খুশির রসে ভরিয়ে দিত মনটি,
জোনাকিরা ঘুরত যখন উড়ন-পিদিম জ্বেলে,
চাঁদ থেকে ভাই ডাকত চাঁদের বুড়ি।
যখন আমি ছোট্ট ছিলাম, আমায় দেখে ফুটত ফুলের কুঁড়ি।

যখন আমি ছোট্ট ছিলাম, বসলে পুকুর-ঘাটে
শুনতে পেতাম মৎস্যরানীর কথা,
দেখতে পেতাম পক্ষীরাজ কোন চলছে আকাশ-বাটে,
বাজত প্রাণে কঙ্কাবতীর ব্যথা।

শিশির-ফোঁটায় কুড়িয়ে পেতাম হীরে,
সোনার স্বপন নাচত আমায় ঘিরে,
ছুটত মায়া-হরিণ কত বৃষ্টি-ভেজা মাঠে,
দুলত মাথায় মেঘের কাজললতা।
যখন আমি ছোট্ট ছিলাম, শুনতে পেতাম না-শোনা সব কথা।

হায়রে আমি নই ছোট আর, মাথার চুলও নয়কো কাঁচা,
পাই না মধু পারুল চাঁপার বনে,
গানের পাখি পালিয়ে গেছে ভেঙে প্রাণের খাঁচা,
রূপকথা আর পড়েনাকো মনে।
শালিখ-টিয়া এখন বকে প্রলাপ,
ফুলবাড়িতে শুকিয়ে গেছে গোলাপ,
রং হারানো চোখ নিয়ে ভাই কেনই যে আর বাঁচা—
এই কথাটাই ভাবছি ক্ষণে ক্ষণে।
হায়রে, আমি নই ছোট আজ, একলা বেড়াই শুকনো কাঁটা-বনে।

বেড়াল-দাদুবুড়োর চিঠি

নমতু-দিদি সোন্তামণি
রাগ করোনা ভাই,
তুমিও দিদি চটলে পরে
রক্ষে আমার নাই।
বলেছি তো অনেকদিনই
গোলাম আমি তব,

হুকুম দিলে এবার আবার
পোষা বেড়াল হব।
খেতে দিও দুধু-ভাতি,
একটু মাছের মুড়ো,
ইঁদুর ধরে দেবে তোমার
বেড়াল-দাদুবুড়ো।
সন্ধে হলে গাইব মজার
ঘুম-পাড়ানি গান,
মিউ-মিউ-মিউ! ম্যাও-ম্যাও-ম্যাও!
ফ্যাঁচ-ফ্যাঁচানি তান।
সোন্তামণি নম্‌তু-দিদি,
জানতে আমি চাই,
বোন্তামণি বোনটি তোমার
দেখতে কেমন তাই।
বাঘ-শিকারে যায় কি আজও
আমার দীপু দাদা?
প্যাঁচা ভায়া মাখছে আজও
পথের ধুলো কাদা?
একটি জোড়া দাদা হল,
একটি জোড়া দিদি,
দেখছি আমার ভাবনা কিছুই
রাখলে না আর বিধি!

শান্ত ছেলে

হুড়ুম দাড়াম ! ঝন্-ঝনা-ঝন্ ! বাপরে, একি ধুম-ধাড়াক্কা !
কাঁপছে বাড়ি, ঝরছে বালি—বুকের ভিতর ঢেঁকির ধাক্কা ?
ঐ যাঃ ! বুঝি ভাঙলো শার্সি,
গুঁড়িয়ে গেল দেওয়াল আর্শি !
কে আছিস রে, গ্যাখ্ রে গিয়ে ফাটল বুঝি মাথার খুলি !
শুনলুম শেষে, হাবুবাবু খেলছেন ঘরে ডাণ্ডাগুলি।

হাবুবাবু ঠাণ্ডা ছেলে, বাপের খুরে পেন্সিল কাটেন,
পুরুত-ঠাকুর বসলে পুজোয় ক্যাঁচ্ করে তাঁর টিকি ছাঁটেন।
লম্বা সুতোয় বঁড়শি গেঁথে,
ছাতের ধারে ওৎটি পেতে
হাবু আছেন ঘুপ্টি মেরে,—পথ দিয়ে যায় ফেরিওলা,
ঝাঁকা থেকে অমনি তাহার ফল কি খাবার টেনে তোলা।

হাবুবাবু লক্ষী ছেলে, ঘরের মেঝেয় গাব্বু খোঁড়েন।
খোকার মাথায় লাট্টু ঘোরান,—খুকির পিঠে ধনুক ছোড়েন।
এয়ার-গানটা কাঁধে নিয়ে
শিকার করতে সেদিন গিয়ে,
জলের কুমির পেলেন নাকো—গ্যালের গায়ে টিক্‌টিকিটে,
মারতে তাকে, লাগল আমার চশমাটাতেই গুলির ছিটে।

হাবুর ফুটবল সেদিন গিয়ে পড়ল পাশের বাড়ির ভিতর।
কর্তা তাদের চটে বলেন—'বল দেব না আজকে রে তোর !

ছেলেপুলের ভাঙবে মাথা,
ওরে গোঁয়ার, জানিস না তা ?'
হাবু বলে কাঁদো মুখে—'ভয় কী তোমার ছেলে গেলে,
একটি মোটে বল তো আমার,—তোমার আছে সাতটা ছেলে।'

হাবুবাবুর ভরসা কত! চ্যাটালো তার বুকের পাটা!
দিনের বেলায় মারতে পারেন ভূতের টাকে দশটা চাঁটা।
বোনের পায়ে ল্যাং লাগিয়ে,
হারিয়ে তারে দেন ভাগিয়ে;
সন্ধে হলেই চক্ষু বুজে—একেবারে খুলে জামা—
মায়ের বুকে লুকিয়ে বলে—'ভূতের গল্প শুনব না মা!'

দুপুরে

চোখ পড়ে ঢুলে গো, মন পড়ে ঢুলে গো,
তপনের মায়াতে,
চোত গেছে পালিয়ে, তাপশিখা জ্বালিয়ে
স্বপনের ছায়াতে।
ফটিকের ধারা কই, চাতকেরা সারা ঐ,—
বুক হল মরু যে।
সুর-ভোলা পাপিয়া। মূর্ছিত কাঁপিয়া
বকুলের তরু যে।
কাছে আর সুদূরে, দুপুরের নূপুরে,
হু-হু তান আগুনের,
শোনা যায় ক্ষিতিতে, শুধু তার স্মৃতিতে
কুহু গান ফাগুনের

গোলাপের রেণু নাই, প্রলাপের বেণু তাই
বাতাসের গুঞ্জে,
একি কাল-বেলি এ, কুঁড়ি তাই এলিয়ে
হুতাশেতে কুঞ্জে।
রাখাল সে ঘুমিয়ে, বাঁশি মুখ চুমিয়ে
ধূপ শুকো হাওয়া রে!
মহিষেরা কর্দম, মাখে শুধু হর্দম
আর খোঁজে ছাওয়া যে!
ঘু-ঘু-ঘু ঐ ডাকে, নির্জনে বৈশাখে
কোথা দূর বনেতে,
রোদ-ভরা পথ দিয়ে, প্রাণ-ভরা ঘুম নিয়ে
আসে সুর মনেতে।
ঘু-ঘু-ঘু ডাকেরে, মরমের ফাঁকেরে
ছায়া-মাখা ছন্দে
যেন সুর নাচেরে, করুণায় যাচেরে
ঘুমেরি আনন্দে।
ঘু-ঘু-ঘু আসে গীত, আকাশে ভাসে প্রীত,
সাথে নিয়ে তন্দ্রা,
চোখ পড়ে ঢুলে গো, মন পড়ে ঢুলে গো,
তাপ আনে তন্দ্রা।

সব মানুষের মনে মনে

মেঘের ফাঁকে নক্সা আঁকে
অর্ধ চাঁদের হাঁসুলি,
ঐ নীলিমা পরছে বুকে
ছায়াপথের কাঁচুলি।
ঝুমুর ঝুমুর ঝিঁঝির নূপুর
ঝুম্-ঝুম্-ঝুম্ রাত্রি দুপুর,
দুল্‌কো ফুলের ফুলবাড়িতে
ঝুম্‌কো গোলাপ, বাঁধুলি।

ঘুমোস নে কেউ, ঘুমোস নে কেউ,
বন্ধ ঘরের বন্দীরা !
আকাশ বাতাস বাজায় কি এক
মৌন সুরের মন্দিরা !
নদীর কূলে দুলে দুলে
ছলাৎ ছলাৎ ছন্দ তুলে
ঢেউগুলিকে দেয় নাচিয়ে
মঞ্জু শ্লোকের ছন্দীরা !

চল্ চল্ চল্ আমার সাথে
নৃত্যচপল ভঙ্গীতে।
শিশু চাঁদের নরম আলোয়,
লক্ষ তারার সঙ্গীতে ;

বাউল মানস প্রজাপতি
আলোক ছায়ায় অবাধ গতি,
ধোঁয়া-ধুলোর ময়লা যত
পালিয়ে যাবে কোন্ ভিতে!

কান্তারে আর তেপান্তরে
উড়িয়ে দে তোর কল্পনা,
ঝর্ণাতলার জলসা ঘরে
চলবে যত জল্পনা।
সব মানুষের মনে মনে
যে সব কবি স্বপ্ন বোনে
ঘুম ভাঙাতে পারলে তাদের
লাভ সে বড় অল্প না!

কবি নজরুল ইসলাম

নজরুল ভাই, মনের মাঝে
রোজই বাজে স্মৃতির সুর,
সেই অতীতের তোমার স্মৃতি—
আজকে থেকে অনেক দূর।
যৌবনেরি স্মৃতি সবুজ
এই জীবনে অমূল্য!
বন্ধু, তাহার বিনিময়ে
চাইনে আমি কোহিনুর।

দরাজ প্রাণের কবি তুমি,
হস্তে ছিল রুদ্র বীণ,
আকাশ বাতাস উঠত দুলে
বক্ষে তোমার রাত্রিদিন।
যেথায় যেতে ছড়িয়ে যেতে
মুক্ত প্রাণের হাস্যকে,
আপন করে নিতে তাকেও,
তোমার কাছে যে অচিন।

দিনের পরে দিন গিয়েছে,
রাতের পরে আবার রাত,
চাঁদের আলোয় ভাসত যখন
আমার বাড়ির খোলা ছাত।
তাকিয়ে গঙ্গা নদীর পানে
গানের পরে গাইতে গান—
মুগ্ধ হয়ে নিতাম টেনে
আমার কোলে তোমার হাত।

হায়, দুনিয়ায় যে দিন ফুরায়,
যায় না পাওয়া আর তাকে।
বসন্ত আর গাইবে নাকো
উঠলে আঁধি বৈশাখে।
তাইতো ঘরে একলা বসে
বাজাই স্মৃতির গ্রামোফোন—
আবার কাছে আসে তখন
দূর অতীতে যে থাকে।

পরমান্ন

পরমান্ন! পরমান্ন! নরম পরম অন্ন!
গামলা নিয়ে বসে আছি তোমায় খাবার জন্য!
রান্নাঘরে গন্ধ পেলে,
কাত্‌লা-রোহিত মৎস্য ফেলে
দৌড়ে যে যাই তোমার কাছে—তুমিই অগ্রগণ্য।
পরমান্ন! পরমান্ন! নরম পরম অন্ন!

তোমায় খাবো চেটেপুটে,
আরাম করে খুঁটে খুঁটে,
মিষ্টি মুখে বলব হেসে—ধন্য, তুমি ধন্য!
পরমান্ন! পরমান্ন! নরম পরম অন্ন!

প্রবন্ধ

শিবদাস ভাদুড়ী

বাংলায় sport বলতে বুঝায় খেলা বা ক্রীড়া-কৌতুক। এখানে জ্ঞানীরা ও-ব্যাপারটাকে মোটেই আমল দেন না বা দিতেন না এবং জাতীয় জীবনে তার বিশেষ প্রয়োজনীয়তাও অনুভব করতেন না। কিন্তু য়ুরোপীয়দের, বিশেষ করে ইংরেজদের কথা স্বতন্ত্র। পুরুষোচিত দেহগঠনের তথা জাতিগঠনের উপযোগী ক্রীড়া-কৌতুকের অসামান্য সাফল্য তারা প্রকৃষ্টভাবে প্রমাণিত করেছে। ইংরেজরা বলে, আমরা ওয়াটার্লু'র যুদ্ধে জিতেছি ইংলণ্ডের ক্রীড়াক্ষেত্রেই। তারা জানে, পঙ্গু দেহে সক্রিয় মস্তিষ্কের চেয়ে সক্ষম দেহে সবল মস্তিষ্কের কার্যকারিতা হচ্ছে বেশি। তারা বড়-বড় পণ্ডিত, বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক ও শিল্পীর সঙ্গে ডন ব্র্যাডম্যান প্রমুখ খেলোয়াড়দেরও স্যর উপাধিতে ভূষিত করতে ইতস্তত করে না।

ক্রীড়াক্ষেত্রে মোহনবাগানের অবদান ভারতবর্ষে অমর হয়ে থাকবে। শিবদাস ছিলেন সেই মোহনবাগানের অতুলনীয় মুকুটমণি। প্রায় চল্লিশ বছর আগে মোহনবাগান ফুটবল খেলার মাঠে বিখ্যাত একটি ইংরেজ খেলোয়াড়ের দলকে পর্যুদস্ত করে যখন শীল্ড লাভ করেছিল, তখন সারা দেশে যে বিস্ময়, আনন্দ ও উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল, এ যুগের বালক ও যুবকদের কথা ছেড়ে দি, প্রৌঢ়রাও তা উপলব্ধি করতে পারবেন না। ও ঘটনাটা হয়ে দাঁড়িয়েছিল প্রায় পলাশীর যুদ্ধের প্রতিশোধের মত। কলকাতার পথে পথে সেদিন যেসব স্মরণীয় দৃশ্য দেখেছি, তা দেখতে পাইনি ভারতের প্রথম স্বাধীনতা দিবসেও।

অতিবৃদ্ধ গিরিশচন্দ্র ঘোষ, দেহ তাঁর রোগে পঙ্গু। তিনি কারবার করেন সাহিত্য ও শিল্প নিয়ে, খেলার মাঠে কোনদিন পদার্পণ করেছেন বলে শুনি নি। এই অভাবিত সংবাদ শুনে উচ্ছ্বসিত

ভাষায় বলে উঠলেন, 'বাঃ! আমাদের আজ বড় আনন্দের দিন! বাংলাদেশের ছেলেদের উপর কিছু ভরসা হচ্ছে। এও যে দেখব তা ভাবিনি।......মনে করে দেখ দেখি, যে লাল মুখ দেখলে আমরা ভয়ে আঁৎকে উঠি, বরাবর মনে করে থাকি আমরা চেষ্টা করলে তাদের চেয়ে intellectually বড় হলেও হতে পারি কিন্তু বাহুবলে তাদের কাছে কস্মিন কালে এগুতে পারব না—শিখ গোরখা কেবল তাদের কাছে যেতে পারে—সেই জাতের মিলিটারি দলকে খেলায় পরাজিত করা কম কাজ নাকি? একটা ভয়—একটা সঙ্কোচ—যেটা শুধু মনগড়া ছায়া—সেটা দূর হয়েছে। এখন আমরা মনে করতে পারি যে বাহুবলে আমরা তাদের সামনে এগিয়ে যেতে পারি—প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে চেষ্টা করে তাদের পরাজয় করতে পারি। বাঃ, খুব বাহাদুর! বাংলাদেশকে এই খেলায় জিতে দশ বছর এগিয়ে দিয়েছে।'

সেই বিখ্যাত খেলায় নেমেছিলেন মোহনবাগানের এগারো জন খেলোয়াড় এবং প্রত্যেকেরই ক্রীড়ানৈপুণ্য হয়েছিল চমৎকার। কিন্তু তাঁদের ভিতরে শিবদাস বিরাজ করেছিলেন মধ্যমণির মত। মোহনবাগানকে বিজয়গৌরবে গরীয়ান করেছিল শিবদাসের প্রতিভাই।

আমি তখন গভর্মেণ্ট আর্ট স্কুলের ছাত্র। মার্কাস স্কোয়্যারে গিয়ে প্রতিদিন ক্রিকেট-ফুটবল-হকি খেলারও চর্চা করি কিছু-কিছু। আমার তখনকার সমসাময়িক খেলোয়াড়দের মধ্যে ভোঙাবাবু, হাবুলবাবু ও স্বর্গীয় ভূতি সুকুল পরে মোহনবাগানের দলে যোগ দিয়েও যশস্বী হয়েছিলেন (শেষোক্ত দুইজন তো শীল্ড-বিজয়ী দলের মধ্যেও ছিলেন)। আর্ট স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার আগে প্রত্যহই গড়ের মাঠে গিয়ে ফুটবল খেলা দেখে আসতুম। সেই সময়ে আমার চোখের সামনেই মোহনবাগান প্রথম ট্রেডস্ কাপ লাভ করে বিখ্যাত হয়ে ওঠে। তখনকার দিনে ঐ প্রতিযোগিতার গৌরব ছিল আজকের চেয়ে অনেক বেশি। কিন্তু মোহনবাগান উপর-উপরি তিন-তিনবার

ট্রেডস্ কাপ জিতে চ্যাম্পিয়ান আখ্যা লাভ করে। তখন তার প্রধান প্রতিযোগী ছিল মিলিটারি মেডিক্যাল ও ন্যাশন্যাল স্পোর্টিং-এর দল। প্রথমোক্ত দলটিতে খেলত অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানরা এবং তাদের উইলিয়ম্‌স্ নামে এক দীর্ঘদেহ যুবকের নিপুণ খেলা এখনো আমার মনে আছে। শেষোক্ত দলটির সব খেলোয়াড়ই ছিলেন বাঙালী এবং তাদের গোলরক্ষক বাঁকাবাবু তখন খুব নামজাদা। ন্যাশন্যাল-এর আর এক খেলোয়াড় ছিলেন ক্ষেত্রবাবু। ছোটখাট বেঁটে মানুষটি, কিন্তু তাঁর অগ্রগতি রোধ করা ছিল অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ব্যাপার। স্মরণ আছে, এক বৎসর ন্যাশন্যাল-এর বিরুদ্ধে উপর-উপরি তিনদিন খেলে মোহনবাগান জয়ী হতে পেরেছিল।

কেবল তিনবার ট্রেডস্ কাপ জয় করার জন্যে নয়, আর এক বিশেষ কারণে মোহনবাগানের নাম ফিরতে লাগল লোকের মুখে মুখে। ইংলণ্ডের অসামরিক দলের মধ্যে তখন সমধিক প্রতাপ ছিল ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাবের। তাকে যে নিম্নতর শ্রেণীভুক্ত কোন দেশীয় দল হারিয়ে দিতে পারে, এটা ছিল একেবারেই কল্পনার অতীত। কিন্তু মোহনবাগান সেই অসাধ্য সাধনই করলে। মিণ্টোফেট-এর এক প্রতিযোগিতায় তার কাছে হেরে গেল ক্যালকাটার দল। কিন্তু মোহনবাগানের দলে একজন বাইরের খেলোয়াড় আছে, এই অজুহাতে কর্তৃপক্ষ সে খেলাটি নাকচ করে দেন।

মোহনবাগানের এইসব বিজয়-যাত্রার অধিনায়ক রূপে অতুলনীয় খ্যাতি অর্জন করলেন শিবদাস ভাদুড়ী।

সাধারণত তিনি লেফট্ লাইনে খেলতেন। একহারা ছিপছিপে দেহ, বিপুল-বপু ইংরেজ প্রতিযোগীদের পাশে কী নগণ্যই দেখাত! কিন্তু বলের উপরে যেমন তাঁর অসামান্য দখল ছিল, তেমনি তাঁর গতিও ছিল অত্যন্ত দ্রুত। প্রতিযোগীদের অনায়াসেই এড়িয়ে একেবারে কর্নারের কাছে গিয়ে তিনি সেণ্টার করতেন, নয় বলটিকে এক পদাঘাতে প্রেরণ করতেন গোলপোস্টের দিকে। লাইন থেকে

তাঁর মত আর কোন খেলোয়াড়কে আজ পর্যন্ত এত বেশি গোল দিতে দেখিনি—অধিকাংশ খেলাতে গোল দেবার কৃতিত্ব অর্জন করতেন তিনিই। হয় নিজে গোল দিয়েছেন, নয় সুগম করে দিয়েছেন গোল দেবার পথ। তাঁর আর একটি অদ্ভুত অভ্যাস ছিল। বেগে ছুটতে ছুটতে এগিয়ে গিয়ে গোলের দিকে বল মেরেই তিনি প্রায়ই হতেন ভূতলশায়ী। হয়ত অতিরিক্ত দ্রুতগতির টাল তিনি সামলাতে পারতেন না।

আর একটি ব্যাপার লক্ষ্য করেছি। লেফট্ ইনে অর্থাৎ ঠিক পাশেই তাঁর দাদা বিজয়দাস ভাতুড়ী না থাকলে শিবদাসের খেলা তেমন খুলত না। দাদার সঙ্গে তাঁর ঠিক মনের মিল ছিল বলেই তাঁরা দুজনেই বুঝতেন দুজনের খেলার ধরন ও কৌশল। সামনে বাধা পেলেই দুই ভাই এমন কায়দার পরস্পরের সঙ্গে বল বিনিময় করতেন যে, প্রতিপক্ষেরা দেখত দুই চক্ষে অন্ধকার। বিজয়দাসও একজন সুচতুর ভাল খেলোয়াড় ছিলেন।

১৯১১ খ্রীস্টাব্দের শীল্ড ফাইন্যাল-এর ছবি আজও চোখের সামনে ভাসছে। কিন্তু কী অবিশ্বাস্য কষ্ট স্বীকার করেই যে সে খেলা দেখতে হয়েছে! জানতুম মোহনবাগানের নামেই মাঠে জনতার সৃষ্টি হয় এবং শীল্ডের চরম খেলায় সেই জনতা যে বহুগুণ বেড়ে উঠবে, এটাও আমার অজানা ছিল না। বেশ সকাল-সকালই মাঠে গিয়ে হাজির হলুম। কিন্তু দেখলুম এক কল্পনাতীত, অসম্ভব দৃশ্য! সমস্ত গড়ের মাঠটা পরিণত হয়েছে জনতা সাগরে, তেমন বিপুল জনতা জীবনে আর কখনো চোখে দেখিনি। খেলার মাঠের দিকেও অগ্রসর হবার কোন উপায়ই নেই। তখন তো গ্যালারি ছিল না, লোকে খেলা দেখত ভাড়া দিয়ে ছয় ফুট থেকে বারো-চোদ্দ ফুট উঁচু মাচানের উপরে চড়ে। নিতান্ত পল্‌কা, বিপদজনক মাচান, প্রায়ই মানুষের ভার সইতে না পেরে হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ত—কারুর মাথা ফাটত, কারুর হাত-পা ভাঙত। কিন্তু সে-সব মাচানেও আর তিলধারণের

ঠাঁই নেই, দ্বিগুণ ভাড়ার লোভ দেখিয়েও একটুখানি পা রাখবার জায়গা সংগ্রহ করতে পারলুম না।

ইডেন গার্ডেনে ফিরে গিয়ে ম্লানমুখে জনকোলাহল শ্রবণ করছি, এমন সময়ে এক পরিচিত ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা, তিনি ঐ বাগানের রক্ষক। আমার দুঃখের কথা শুনে তিনি তখনই একখানা লম্বা মই আনিয়ে বললেন, "দক্ষিণ দিকের একটা দেবদারু গাছে চড়ে খেলা দেখুন!" অন্য কোন উপায় না দেখে তাই করতে হল।

প্রায় আড়াই তালা উঁচু একটা ডালের উপরে বসে সানন্দে দেখলুম, জনতার ফ্রেমে বাঁধানো গোটা খেলার মাঠটি চোখের সামনে পড়ে রয়েছে। বাইরের মাঠও মানুষের মাথায় মাথায় কালো হয়ে উঠেছে, কিন্তু তখনও জনতার পর জনতার স্রোত। দেখতে দেখতে দুই পক্ষের খেলোয়াড়দের আবির্ভাব, রেফারির বংশীধ্বনি এবং খেলা হল শুরু।

মোহনবাগানের প্রতিযোগী ঈস্ট ইয়র্কের দল ঠিক বিজেতার মতই প্রবল বিক্রমে খেলতে লাগল, বাঙালীরাও বাধা দিতে লাগল প্রাণপণে। বল একবার ছুটে যায় ওদিকে, আবার ছুটে আসে এদিকে। অবশেষে মোহনবাগানের গোল থেকে বেশ খানিকটা দূরে ঈস্ট ইয়র্ক পেলে একটি ফ্রি কিক্। কিন্তু কী দুর্বিপাক! গোলরক্ষক হীরালালকে এড়িয়ে বল সাঁৎ করে ঢুকে গেল মোহনবাগানের গোলপোস্টের ভিতরে। বাঙালী দর্শকরা বজ্রাহত! ইংরেজরা প্রচণ্ড আনন্দে উন্মত্ত—চিৎকার করতে করতে কেউ লাফায়, কেউ শূন্যে টুপি ছোঁড়ে, কেউ পায়রা উড়িয়ে দেয়। কালা আদমির কাছে পরাজয়! কবি হেমচন্দ্রের ভাষায়—'নেভার, নেভার!'

কিন্তু তারপরেই পাওয়া গেল শিবদাসের অপূর্ব প্রতিভার আশ্চর্য পরিচয়! তিনি যেন মরিয়া, তিনি যেন একাই একশো! তাঁর স্থান যে লেফট্ লাইনে এ কথা আর তাঁর মনে রইল না—কখনো তিনি মাঠের ডানদিকে, কখনো মাঝখানে, কখনো পুরোভাগে, কখনো

এদিকে, কখনো ওদিকে, কখনো সেদিকে এবং বলও ছুটছে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে। সর্বত্রই শিবদাস! সে যেন ঈস্ট ইয়র্ক বনাম শিবদাসের খেলা! আচম্বিতে শিবদাসের পদ ত্যাগ করে একটি বল উল্কাবেগে ছুটে গেল ঈস্ট ইয়র্কের গোলের দিকে এবং তখনকার সর্বশ্রেষ্ঠ গোলকীপার ক্রেসি তাকে স্পর্শ পর্যন্ত করতে পারলেন না।

গোল! গো-ও-ল! গো-ও-ল! বিশাল জনসাগরের সেই গগনভেদী কোলাহল গঙ্গার ওপার থেকেও শোনা গিয়েছিল। আমার পাশের গাছের একটা উঁচু লম্বা ডালে মাথার উপরকার আর একটা ডাল ধরে শাখামৃগের মত সারি সারি বসে ছিল দশ বারোজন লোক। উত্তেজনায় আত্মবিস্মৃত হয়ে উপরকার ডাল ছেড়ে তারা দুই হাতে তালি দিতে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে ঝুপ্-ঝুপ্ করে মাটির উপরে গিয়ে অবতীর্ণ হল সশব্দে। তাদের আর্তনাদ শুনতে শুনতে সভয়ে আমি কোঁচা খুলে গাছের গুঁড়ির সঙ্গে নিজের দেহকে বেঁধে ফেললুম। কি জানি বাবা, বলা তো যায় না, আমারও যদি দৈবাৎ হাততালি দেবার শখ হয়!

মায়াবী শিবদাসের ইন্দ্রজাল তখনও শ্রান্ত হয়নি, তখনও তিনি বল নিয়ে দুর্বার গতিতে ছুটোছুটি করছেন এখানে ওখানে যেখানে সেখানে। রীতিমত মস্তিষ্ক চালনার সঙ্গে সঙ্গে পদচালনা না করলে সেরকম খেলা কেউ খেলতে পারে না। প্রতিপক্ষের দশাসই চেহারাগুলো কিছুতেই তাঁর ক্ষিপ্রগামী ছিপছিপে দেহের নাগাল ধরতে পারছে না—যেন তিনি আলেয়া। আবার তিনি হলেন গোলের নিকটবর্তী। একজন প্রতিযোগী বাঘের মত তাঁর সামনে এসে পড়ল, কিন্তু তিনি টুক্ করে বলটি তুলে দিলেন নিজেদের সেণ্টার ফরোয়ার্ড অভিলাষের পায়ের উপরে এবং অভিলাষও কিছুমাত্র ভুল করলেন না।

আবার ইংরেজদের কানে ভয়াবহ সেই হাজার হাজার কণ্ঠের

আকাশ-ফাটানো জয়ধ্বনি ও করতালি! নর্তন ও কুর্দন! সাহেবদের আসনে সমাধির স্তব্ধতা।

বাজল খেলাশেষের বাঁশি। বাঙালীর প্রথম শীল্ড অধিকার। পুরুষোচিত ক্রীড়াক্ষেত্রে কালোর কাছে গোরার প্রথম পরাজয়। তার পরের দৃশ্য বর্ণনাতীত। বাড়ি ফিরেছিলুম সারা শহর মাড়িয়ে, অনেক রাতে।

খেলার মাঠে সেদিন শিবদাসের যে ব্যক্তিত্বের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলুম তার তুলনা পাই নি অদ্যাবধি। অবশ্য তার পরে তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত হবার ও আলাপ করবার সুযোগ পেয়েছিলুম বটে, কিন্তু ক্রীড়কের বিশেষত্ব ক্রীড়ানৈপুণ্যে, তাই তার মুখের ভাষা লিপিবদ্ধ না করলেও ক্ষতি নেই।

মরণ-বিজয়ীর দল

রবীন্দ্রনাথের মুখে তোমরা বন্দীবীর বান্দার অপূর্ব কাহিনী শ্রবণ করেছ। চিত্তোত্তেজক গল্পের দিক দিয়ে ধরলে, ও গাথাটির তুলনা নেই।

কিন্তু এখানে সাধারণ পাঠকের কথা ছেড়ে দিচ্ছি। কারণ আমরা বলব ইতিহাসের কথা এবং রবীন্দ্রনাথের ঐ কবিতাটি পাঠ করলে ঐতিহাসিকেরা খুব বেশি বোধ করি অভিভূত হবেন না।

বান্দা যে জাতির জন্যে, ধর্মের জন্যে প্রাণ বিলিয়ে দিয়েছিলেন, সে কথা কেহই অস্বীকার করতে পারবেন না। কিন্তু মোগল সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে মুসলমান নরনারী—এমনকি অজাত শিশুর উপরে তিনি যেসব অকথ্য, অমানুষিক ও পৈশাচিক অত্যাচার করেছিলেন, ইতিহাসে তা স্পষ্ট ভাষায় লেখা আছে। অধিকন্তু বান্দার অনুচরদের কবল থেকে বহু হিন্দুও মুক্তিলাভ করতে পারেন

নি। এইসব কথা মনে করলে বান্দার প্রতি আমাদের সহানুভূতি যথেষ্ট দুর্বল হয়ে পড়ে এবং বলতে ইচ্ছা হয় যে, বান্দা একজন সাধারণ অপরাধী ছাড়া আর কিছুই ছিলেন না।

রবীন্দ্রনাথের কবিতায় উজ্জ্বল ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে, বান্দা কেমন করে স্বহস্তে নিজের পুত্রকে বধ করেছিলেন। কিন্তু ইতিহাস বলে, বান্দা স্বহস্তে পুত্রহত্যা করেন নি। ব্যাপারটা হয়েছিল আরও মর্মন্তুদ, আরও ভয়ানক।

বধ্যভূমিতে (দিল্লীর কুতুব মিনারের সামনে) বন্দী বান্দার কোলে তাঁর তিন বছরের ছেলেকে তুলে দিয়ে বলা হল, 'একে হত্যা কর।'

বান্দা হুকুম গ্রাহ্য করলেন না। এমন হুকুম তামিল করতে পারে না কোন পিতাই।

ঘাতক তখন এক সুদীর্ঘ ছুরিকার আঘাতে শিশুকে হত্যা করলে এবং তার উদরের ভিতর থেকে যকৃত টেনে বের করে বান্দার মুখের ভিতরে ঢুকিয়ে দিলে।

তারপর বিষম যন্ত্রণা দিয়ে একে-একে শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে নিয়ে বান্দাকেও হত্যা করা হল।

কয়েক বৎসর ধরে পাঞ্জাবের দিকে দিকে বিদ্রোহের ধ্বজা তুলে রাজশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধের পর যুদ্ধ করে বান্দা শেষটা সদলবলে বন্দী হলেন গুরুদাসপুর গড়ে (১৭১৫ খ্রীঃ)। দীর্ঘ ছয় বৎসর ধরে যে বিদ্রোহী মোগল সম্রাটের বিপুল জনবল ও অর্থবল ব্যর্থ করে এসে-ছিলেন, তাঁর ভাণ্ডার লুণ্ঠন করে পাওয়া গেল মাত্র ১,০০০ তরবারি, ২৭৮ ঢাল, ১৭৩ ধনুক, ১৮০ বন্দুক, ১১৪ ছোরা, ২১৭ লম্বা ছুরি, খানকয় সোনার গহনা, ২৩টি মোহর ও কিছু-বেশি ৬০০ টাকা। গুরুদাসপুর গড়ও মোগলরা গায়ের জোরে কেড়ে নিতে পারে নি, কেবল নির্জল উপবাসের যন্ত্রণা সইতে না পেরেই শিখেরা আত্ম-সমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছিল। কোন-কোন ঐতিহাসিক বলেন,

দুর্গের মধ্যে অবরুদ্ধ শিখদের দুর্দশা এমন চরমে উঠেছিল যে, অনেকে নাকি অন্য খাদ্যের অভাবে আপন আপন উরু থেকে মাংস কেটে নিয়ে আগুনে পুড়িয়ে তারই সাহায্যে করেছিল উদর-পূর্তি।

গুরুদাসপুর গড়ের পতনের পর যে নাটকীয় দৃশ্যের অভিনয় হয় এবং শিখদের যে অলৌকিক বীরত্বের পরিচয় পাওয়া যায়, তা নিয়ে একাধিক বিচিত্র কাব্য রচনা করা যেতে পারে। কিন্তু আমি এখানে কবিতা কিংবা অত্যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করব না। সাধাসিধে ভাষায় সোজাসুজি মূল ঘটনাগুলি বর্ণনা করে যাব। দেখবেন, তার ভিতরেই অসাধারণ রূপ ফুটে উঠে হৃদয়কে অভিভূত করে দেবে।

অগুন্তি শিখকে হত্যা করা হল। সাতশত চল্লিশ জন শিখ হল বন্দী। দিল্লীর রাজ-দরবার থেকে হুকুম এল—ছত্রপতি শিবাজীর পুত্র রাজা শম্ভুজীকে বন্দী করে যেভাবে রাজধানীতে নিয়ে আসা হয়েছিল, বান্দা ও তাঁর অনুচরদেরও সেইভাবে দিল্লীতে নিয়ে আসতে হবে।

নির্দিষ্ট দিনে দিল্লী দুর্গের লাহোরী ফটক থেকে আমারাবাদ পর্যন্ত কয়েক মাইল-ব্যাপী পথের দুই ধার জুড়ে দাঁড়াল অস্ত্রধারী সৈনিকরা এবং পথের উপর ভেঙে পড়ল বিপুল জনতা-সাগরের তরঙ্গের পর তরঙ্গ।

প্রথমেই দেখা গেল, হাতির উপরে লোহার খাঁচা এবং তার ভিতরে বন্দী বান্দা। অঙ্গে তাঁর স্বর্ণখচিত সমুজ্জ্বল ও বহুমূল্য পোশাক। পিছনে দাঁড়িয়ে লৌহবর্মধারী মোগল সেনানী, হাতে তার নগ্ন তরবারি। বান্দার হাতির সুমুখে দেখা যাচ্ছে শত-শত বংশদণ্ডের উপরে নিহত শিখ যোদ্ধাদের ছিন্ন মুণ্ড, তাদের লম্বা চুল-গুলো মুখের উপরে পড়ে দুলছে ঝালরের মত।

বান্দার হাতির পিছনে পিছনে আসছে দলে-দলে উট। প্রত্যেক উটের উপরে বসে আছে দু-জন করে শিখ বন্দী। তাদের পরিয়ে

দেওয়া হয়েছে বিসদৃশ পোশাক, অনেককে দেখতে হয়েছে পশুর মত।

জনতার মধ্যে জাগল ঘন-ঘন জয়ধ্বনি। বন্দীদের লক্ষ্য করে অনেকে টিটকারি দিতে লাগল। কিন্তু বন্দীরা তা শুনে বিচলিত হল না। মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও তারা কেউ ভীত ভাব প্রকাশ করলে না, বরং অনেকের মুখ দেখলে মনে হয় যেন তারা সানন্দে চলেছে কোন উৎসব-সভার দিকে।

কেউ ঠাট্টা করলে তারা নির্ভয়ে পাল্টা জবাব দিতেও ছাড়লে না। কেউ তাদের "খুন করব" বলে ভয় দেখালে তারা বলে, "মারো, আমাদের মেরে ফেল—মৃত্যুকে আমরা ভয় করব কেন? কেবল ক্ষুধা-তৃষ্ণা সইতে না পেরেই আমরা তোমাদের হাতে ধরা দিয়েছি। আমাদের সাহস আর বীরত্ব কি তোমরা জান না?"

স্থির হল, প্রতিদিন একশো জন করে বন্দীকে বধ করা হবে।

বধ্যভূমিতে দর্শকদের দলে উপস্থিত ছিলেন কয়েকজন য়ুরোপীয় ভদ্রলোকও। সকলেই বলেন, মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েও শিখ বন্দীরা যে ধীরতা, দৃঢ়তা ও বীরত্বের পরিচয় দিলে, তা বিস্ময়কর!

বন্দীদের বলা হল, "জীবন ভিক্ষা চাও তো মুসলমান হও।"

প্রত্যেক বন্দী এককণ্ঠে বললে, "মুণ্ড দেব, ধর্ম দেব না।"

তাদের কারুর এতটুকু মৃত্যুভয় নেই, ঘাতককে ডাকতে লাগল "মুক্তিদাতা" বলে। সকলে মহা আনন্দে ঘাতকের সামনে ছুটে গিয়ে চিৎকার করে বলতে লাগল, "মুক্তিদাতা, আগে আমাকে হত্যা কর!"

সাড়ে সাতশত শিখ বন্দী। প্রতিদিন নিয়মিতভাবে তরবারি শূন্যে ওঠে চকমকিয়ে এবং পরমুহূর্তে নিচে নেমে উড়িয়ে দেয় এক-এক বীরের মুণ্ড। কাটতে কাটতে তরবারি ভোঁতা হয়ে যায়, আবার তাকে শানিয়ে নিতে হয়। সাতশত চল্লিশজন বন্দীর ভিতর থেকে একজন মাত্র মৃত্যুভীত কাপুরুষকে পাওয়া গেল না। সাতশত

চল্লিশ মহাবীর একে-একে মুণ্ড দিলে, ধর্ম দিলে না। সাতশত চল্লিশ মহাবীরের রক্ত শোষণ করে বধ্যভূমি হয়ে উঠল বীরভূমি।

বান্দা তো দলের নেতা, সব দিক বুঝে প্রস্তুত হয়েই তিনি ধারণ করেছিলেন বিদ্রোহের পতাকা। কিন্তু এই সাতশত চল্লিশ জন শিখ, এদের অধিকাংশই সাধারণ লোক—অনেকেই হয়ত নিরক্ষর ও চাষাভুষো শ্রেণীর। তবু এদের কেউ ধর্মের বিনিময়ে জীবন ভিক্ষা করলে না। বান্দার মৃত্যুর চেয়েও এদের আত্মদান অধিকতর গৌরবময়।

প্রতিদিন উচ্চ হয়ে ওঠে মৃতদেহের স্তূপ। মৃত্যুর পরেও বীরদেহ-গুলির উপরে কিছুমাত্র সম্মান প্রকাশ করা হল না। গাড়িতে করে দেহের স্তূপ নগরের বাইরে চালান করা হল। তারপর প্রত্যেক দেহকে ঝুলিয়ে দেওয়া হল গাছের ডালে।

কিন্তু এর চেয়েও স্মরণীয় ঘটনা আছে। আমরা মরণের ভয়ের কথাই জানি, মরণের আনন্দের কথা বড়-একটা শোনা যায় না। আজীবন প্রাণ বাঁচাতে বাঁচাতেই আমাদের প্রাণান্ত হয়, জীবনকে ঘৃণা করবার ও মরণকে ভালবাসবার আশ্চর্য সুযোগ হয় কয়জনের ?

কুতব-উল্-মুল্ক ছিলেন তখন ভারত-সম্রাটের উজির। তিনি হচ্ছেন সেই ইতিহাস-বিখ্যাত সৈয়দ-ভ্রাতৃযুগলের অন্যতম—যাঁদের প্রভাবে বা কৃপা-কটাক্ষে ময়ূর-সিংহাসনের উপরে বসেছেন সম্রাটের পর সম্রাট। কুতব-উল্-মুল্কের হিন্দু দেওয়ানের নাম রতনচাঁদ। তিনি উজিরের বিশেষ প্রিয়পাত্র।

এক নারী রতনচাঁদের কাছে গিয়ে ধর্না দিয়ে পড়ল।

নারী বললে, "হুজুর, আমি অসহায়া বিধবা। আমাকে দয়া করুন।"

রতনচাঁদ জিজ্ঞাসা করলেন, "কে তুমি ?"

—"আমি এক বালক শিখ-বন্দীর মা।"

—"আমার কাছে এসেছ কেন ?"

—"আমার বালক পুত্রের উপর প্রাণদণ্ডের হুকুম হয়েছে। ঐ ছেলেটি ছাড়া এই দুনিয়ায় আমাকে আর দেখবার লোক কেউ নেই। সে মারা পড়লে আমার কী গতি হবে হুজুর!"

—"তোমার ছেলেকে বাঁচাবার ক্ষমতা আমার নেই। সে বালক হতে পারে, কিন্তু রাজবিদ্রোহী।"

—"হুজুর, আমার ছেলে রাজবিদ্রোহী নয়। এমনকি সে গুরু বান্দার শিষ্যও নয়। তার বিরুদ্ধে সমস্ত অভিযোগ মিথ্যা। তাকে ভুল করে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। হুজুর, তাকে রক্ষা করে এই অনাথাকে রক্ষা করুন!"

অবশেষে মায়ের সেই করুণ ক্রন্দন আর সহ্য করতে না পেরে দেওয়ান রতনচাঁদ তাঁর আরজি নিয়ে গেলেন উজিরের কাছে। প্রিয় পাত্রের অনুরোধ এড়াতে না পেরে কুতব-উল্-মুল্ক সেই বিধবা নারীর বালক-পুত্রকে জীবন ভিক্ষা দিলেন।

বেচারা মা আনন্দের অশ্রুজল ফেলতে ফেলতে উজিরের আদেশ-পত্র নিয়ে ছুটল কোতোয়ালের কাছে।

বন্দীকে কারাগারের বাইরে এনে কোতোয়াল বললে, "তুমি মুক্ত।"

বালক সবিস্ময়ে বললে, "আমি মুক্ত? না না, এ অসম্ভব!"

তার মা কাছে এগিয়ে এসে বললে, "হ্যাঁ বাছা, তুমি মুক্ত। তুমি তো বিদ্রোহী গুরুর শিষ্য নও, তাই আমার কথা শুনে উজির মশাই তোমায় ছেড়ে দিয়েছেন।"

ভয়াবহ মৃত্যুকে পিছনে রেখে সামনে এসে দাঁড়াল নবযৌবনের উদ্দাম জীবন। নূতন আশায় উচ্ছ্বসিত জননীর স্নেহ-হাসিমাখা মুখ। কিন্তু সেদিকে না তাকিয়ে প্রাণপণে হৃদয়ের আবেগ দমন করে বালক কঠিন স্বরে কোতোয়ালকে জিজ্ঞাসা করলে, "কে এই নারী?"

কোন জননীর সামনে কোন পুত্রের মুখে এমন নিষ্ঠুর কথা বোধহয় আর কখনো উচ্চারিত হয় নি। মা তো একেবারে অবাক!

হয়ত ভাবলেন, জেলখানায় গিয়ে মৃত্যুভয়ে ছেলের মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে।

কোতোয়াল বিস্মিত কণ্ঠে বললে, "সেকি, ইনি যে তোমার মা!"

বালক অবিচলিত কণ্ঠে বললে, "না, এই নারীকে আমি চিনি না।"

—"ইনি তোমার মা নন?"

—"না। ইনি কী চান তাও আমি জানি না। এঁর কথা সত্যি নয়। আমি বিদ্রোহী, আমি গুরুজীর শিষ্য। গুরুজীর সঙ্গে আমিও প্রাণ দিতে চাই। জয়, গুরুজীর জয়!"

বালক জীবন ভিক্ষা নিলে না, জীবন দান করলে।

পৃথিবীর কোন দেশের ইতিহাসে আছে এর চেয়ে অদ্ভুত কাহিনী?

ধাঁধা

১। আমায় মাথায় ঘুরিয়ে লোকে ফেলে দেয়। যাবার সময় আমি আমার ল্যাজ ফেলে যাই। দরকার হলে তোমরা আমার ল্যাজ ধরে টানো। কিন্তু আমি কোন জন্তু নই। বল সে আমি কে?— উত্তর : মাছধরা জাল।

২। এমন কী জীব আছে যার মাথা তো নেইই, মুখও নেই পেটও নেই। কিন্তু ক্ষিদে আছে বিষম। তার পা নেই অথচ সব জায়গাতেই যেতে পারে। ডানা নেই অথচ শূন্যে থাকতে পারে। সাঁতার জানে না কিন্তু ডুবেও মরে না? উত্তর : বীজাণু।

হেমেন্দ্রকুমার-লিখিত ছোটদের বইয়ের তালিকা

যকের ধন, মেঘদূতের মর্ত্যে আগমন, ময়নামতীর মায়াকানন, আবার যকের ধন, অমাবস্যার রাত, হিমালয়ের ভয়ঙ্কর, কুবেরপুরীর রহস্য, অসম্ভবের দেশে, নীলসায়রের অচিন পুরে, স্বর্ণনগরীর গুপ্তধন, যক্ষপতির রত্নপুরী, ভৌতিক গল্প, রবিবারের মজা, রকমারি গল্প, রহস্যের আলোছায়া, মান্ধাতার মুল্লুকে, সোনার পাহাড়ের যাত্রী, বিমল-কুমারের কীর্তি-কাহিনী, জয়ন্তের কীর্তি, মরণ-খেলার খেলোয়াড়, পদ্মরাগ-বুদ্ধ, মানুষ-পিশাচ, মৃত্যু-মল্লার, সোনার আনারস, হত্যা হাহাকারে, বজ্রভৈরবের মন্ত্র, হত্যাকারী-হত্যাকাহিনী, জয়ন্তের আরো নতুন কীর্তি, শনিমঙ্গলের রহস্য, ছত্রপতির ছোরা, নবযুগের মহাদানব, ফিরোজা-মুকুট রহস্য, সাজাহানের ময়ূর, জয়ন্তের অ্যাডভেঞ্চার, ড্র্যাগনের দুঃস্বপ্ন, অমৃত দ্বীপ, নৃমুণ্ড-শিকারী, জেরিনার কণ্ঠহার, সুন্দরবনের রক্তপাগল, কুমারের বাঘা গোয়েন্দা, সুলুসাগরের ভুতুড়ে দেশ, প্রশান্তের আগ্নেয় দ্বীপ, প্রভাত-রক্তমাখা, অন্ধকারের বন্ধু, রাত্রির যাত্রী, মুখ আর মুখোস, বিভীষণের জাগরণ, মায়ামৃগের মৃগয়া, বজ্র আর ভূমিকম্প, নীলপত্রের রক্তলেখা, ব্যাধের ফাঁদ, সূর্যকরের দ্বীপে, গুপ্তধনের দুঃস্বপ্ন, বাঘরাজের অভিযান, নিশাচরা বিভীষিকা, চতুর্ভুজের স্বাক্ষর, অমানুষিক মানুষ, হিমাচলের স্বপ্ন, রুনুটুনুর অ্যাডভেঞ্চার, অজানা দেশের রানী, মানুষের গন্ধ পাই, সত্যিকার শার্লক হোম্‌স্‌, হত্যা এবং তারপর, চল গল্প-নিকেতনে, গোয়েন্দা ভূত ও মানুষ, ভালো-ভালো গল্প, জয়ন্তের প্রতিমূর্তি, ছায়া-কায়ার মায়াপুরে, ভয় দেখানো ভয়ানক, সন্ধ্যার পরে সাবধান, রাত্রে যারা ভয় দেখায়, যাদের নামে সবাই ভয় পায়, আঁধার রাতের অতিথি, রক্ত-বাদল ঝরে, মোহন-মেলা, মধুছত্র, পালোয়ান প্যালারাম, ছুটির ঘণ্টা, আজব দেশে অমলা, মানব দানব, অদৃশ্য মানুষ, বিশালগড়ের দুঃশাসন, মোহনপুরের শ্মশান, মানুষের গড়া দৈত্য, ছোট্ট পমির অভিযান, দিগ্বিজয়ীর তরবারি, ভগবানের চাবুক, আলো দিয়ে গেল যারা, ইতিহাসের রক্তাক্ত প্রান্তরে, প্রেতাত্মার প্রতিশোধ, কাউণ্ট্‌ অব্‌ মন্টি ক্রিস্টো, ইন্দ্রজালের মায়া, পঞ্চনদের তীরে, দেড়শো খোকার কাণ্ড, আলেকজাণ্ডার দি গ্রেট, সর্বনাশা নীলা, ভারতের দ্বিতীয় প্রভাতে, মহাভারতের মহামানব, মহাভারতের শেষ মহাবীর, বিমানের

নতুন দাদা, দিগ্বিজয়ী নেপোলিয়ন, সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র, ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প, গল্প সঞ্চয়ন, কিশোর সঞ্চয়ন, ভূত আর অদ্ভুত, আধুনিক রবিন হুড, কিং কঙ, সুন্দরবনের মানুষ-বাঘ, মড়ার মৃত্যু, হেমেন্দ্র গ্রন্থাবলী। সম্পাদক : কলরব, আকাশদীপ, দেশের মাটি, ছায়াপথ, মনোরথ, সারথি, সুপ্রভাত, তপোবন, কল্পতরু, অরবিন্দ, মাসিক রংমশাল।

এর মধ্যে দু-একটি নাম বাদ পড়ে যেতে পারে, কারণ সর্বাঙ্গীন তালিকা পাবার উপায় নেই। কয়েকটি বই অনেকদিন আগে একবার প্রকাশিত হয়ে নিঃশেষ হবার পর আর ছাপা হয় নি।